ভারতীয় সমাজ

কিশোর ভারত গ্রন্থমালা

ভারতীয় সমাজ

এস.সি.দুবে

অনুবাদ
রজত রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

এই বইটি প্রাকৃতিক-ভারসাম্য সহায়ক পুনরুৎপাদিত কাগজে মুদ্রিত।

ISBN 81-237-1866-7

1996 (শক 1918)

মূল্য : 30.00 টাকা
Indian Society *(Bangla)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

এই বইটি সেইসব তরুণ পাঠকদের কথা ভেবে লেখা, যারা ভারতীয় সমাজের উৎপত্তির ইতিহাস, দার্শনিক পটভূমিকা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে কিছুটা জানতে আগ্রহী। একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে সমাজ-পরিবর্তনের প্রধান প্রধান ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যার জন্য ইতিহাস, ভারততত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আমার মনে হয়, সমাজবিজ্ঞানের এই সব বিভিন্ন শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা ভারতের সামাজিক বাস্তবকে বোঝার ক্ষেত্রে নিতান্তই জরুরী।

ভারতের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, ভারতের সামাজিক কাঠামোও অত্যন্ত জটিল। বহু বর্ণে চিত্রবিচিত্র এই জটিল সমাজকে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়। স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরে আচার ব্যবহারে, সামাজিক রূপরেখার যে প্রভেদ ধরা পড়ে, তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা এই ছোট্ট বইয়ের পরিসরে অসম্ভব। তা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছি, ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্যময় দিকগুলির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার যোগসূত্রগুলিও খতিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে। আশা করি, বইটি পাঠককে বিভ্রান্ত বা সংশয়াপন্ন করবে না।

বইয়ের ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। বেশ কয়েক দশক ধরে সমাজতাত্ত্বিকরা এমন একটা ভাষাশৈলীতে চর্চা করে চলেছেন যে, সাধারণ বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই এ বিষয়ের বই পড়ার চেষ্টা থেকে বিরত হন। সে দিকে খেয়াল রেখে এই বইটির ভাষা যথাসম্ভব সরল করার চেষ্টা করেছি। নেহাতই বাধ্য হয়ে কোথাও কোথাও সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু সে সবই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, নিতান্তই সম্ভব না হলে পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছি।

সব ইতিহাস বা সমাজতাত্ত্বিক রচনাই এক অর্থে পুনর্নির্মাণ। নিরপেক্ষতম লেখকের বেলাতেও তাঁর নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন এড়ানর উপায় নেই। এ বইয়ের ক্ষেত্রেও আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে প্রভাবিত করে থাকতেই পারে। কিন্তু মনোমত দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কোথাও আমি তথ্যবিকৃতি

ঘটতে দিইনি। পরিশিষ্টে কিছু বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছি। আরও গভীরে যেতে আগ্রহী পাঠক ওই বইগুলি থেকে ভিন্ন মতের খোরাক পাবেন।

জ্ঞানচর্চার একটি প্রধান দিক হল, মনের দিগন্ত প্রসারিত করা। বইটি লেখার সময় সেই কথাটাও মাথায় ছিল। ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বইটি কিছুটা যুক্তিনিষ্ঠ সচেতনতা ও আগ্রহ জাগাতে পারবে বলে আমার আশা। সেই সঙ্গে ভারতের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে চিন্তাভাবনাকেও হয়ত নাড়া দিতে পারবে। রহস্যের মোড়ক থেকে বাইরে আনলেই ইতিহাস ও পুরনো ঐতিহ্যকে বোঝা সহজ হয়।

বইটির রচনা সম্পর্কে রবি দয়াল তাঁর সযত্ন গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন।

এস. সি. দুবে

সূচিপত্র

এক

ভারতীয় সমাজের গোড়ার পর্ব

ভারতীয় সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন ও একইসঙ্গে তার কাঠামোও খুবই জটিল। প্রথম পরিজ্ঞাত সভ্যতার হিসাব থেকে শুরু করলে এই সমাজ ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার বছর অতিক্রম করে ফেলেছে বলে ধরা যায়। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বিদেশি মানুষের ঢেউ এসে এই সমাজের মধ্যে মিশেছে। বিভিন্ন জাতিসত্তা ও ভাষাভাষীর ঢেউ এভাবে ভারতীয় জনস্রোতে মিশে জনজীবনকে বৈচিত্র্যময়, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে।

বর্তমান ভারতীয় সমাজের মধ্যে একইসঙ্গে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বিবর্তনের স্তরের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। একই সমাজের মধ্যে রয়েছে একদিকে শিকার প্রভৃতি উপায়ে খাদ্যসংগ্রহের আদিম ব্যবস্থা, যাযাবরশ্রেণী (যারা ছাগল ভেড়া অথবা গরু পালন করে, টুকিটাকি বিক্রি করে বেড়ায়) এবং জুম চাষব্যবস্থা। জুম চাষে হাল-বলদের পরিবর্তে চাষিরা লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফসল বোনে এবং একজায়গায় স্থায়ী বসবাস করে না। অন্যদিকে রয়েছে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গ্রামীন কারিগর ও হস্তশিল্পীরা এবং কৃষিজীবী, ভূস্বামী ও দীর্ঘদিনের পুরনো সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ সহ বিশ্বের প্রায় সব কয়টি প্রধান ধর্মের অনুগামীরাই এদেশে আছে। এর সঙ্গে যদি আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী আমলাতন্ত্র, বিজ্ঞান ও শিক্ষাজগতের মানুষদের যোগ করা হয়, তাহলেই দেখা যাবে সমাজে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসঙ্গেই অবস্থান করছে। বিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ একটি মিশ্র (Composite) সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছে যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল বহুত্ব।

ভারতের আদিম অধিবাসীদের সনাক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। যেহেতু সেই সময়ে লেখার ব্যাপারটাই আবিষ্কার হয়নি, তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে ওই সময়ের কোনও লিখিত নথি নেই। জনশ্রুতির যে ঐতিহ্য রয়েছে, তা থেকেও খুব একটা আলোকপাত করা সম্ভব নয়, কারণ পরবর্তী কালে তাতে অনেক অদলবদলের ফলে তাকে ইতিহাসের পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা মুশকিল। প্রাক-ইতিহাস যুগের সাক্ষ্যপ্রমাণ বরং তুলনায় কিছুটা বিশ্বাসজনক, যদিও তা থেকে সামগ্রিক চিত্রটা কমই ধরা পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি অনেক

তথ্যই কালের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। এখন আমরা জানি যে, ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন মানুষের অস্তিত্বের সময়টা দ্বিতীয় আন্তঃ-তুষার যুগ (inter-glacial period)-এর সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব 4,00,000 থেকে 2,00,000 বছরের মধ্যে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সব গুহাচিত্রের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে, তাতে জীবন ও পরিবেশের কিছু চিত্র ধরা আছে। তখনকার মানুষের নান্দনিক দিক, সৃষ্টিকর্ম এমনকি সম্ভবত কিছুটা প্রাথমিক স্তরের অধিবিদ্যাসংক্রান্ত চিন্তাভাবনাও তাতে ধরা পড়ে। স্মৃতিস্তম্ভ ও মৃতের স্মারক হিসাবে বড় বড় পাথরকে ব্যবহার করার সঙ্গেই লোহা, ব্রোঞ্জ এমনকি সোনার ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞানের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। এখন পুরাতত্ত্বের আধুনিক গবেষণার সুবাদে তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। তখন মানুষ কী ভাবে থাকত, কী কী শস্য ফলাত, কী খেত এসবই কিছু কিছু জানা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা জানা সম্ভব হয়নি, কারা প্রথম ভারতে এসেছিল, এবং তার পরে পরে কোন পরম্পরায় অন্যরা এদেশের মাটিতে পা রেখেছিল।

এই অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের আদিবাসিন্দা (autochthons) সম্পর্কে একটা ধারণা বা আন্দাজ অবশ্য আমরা করতেই পারি। সেটা করা যায়, ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে যে সব জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের সম্পর্কে নৃতত্ত্ব (physical anthropology) থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই। অর্থাৎ জাতিসত্ত্বা, জাতিগোষ্ঠী ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য থেকেই এই ধারণার রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করা যেতে পারে। ভারতীয় জনসমষ্টির জাতি ও গোষ্ঠীগত শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত কাজটি যিনি করেছেন তাঁর নাম বি. এস. গুহ। তিনি ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে ছয়টি প্রধান জাতির অবস্থান চিহ্নিত করেছেন: নেগ্রিটো, প্রটো-অস্ট্রেলয়েড, মঙ্গলয়েড, মেডিটেরানিয়ান, ওয়েস্টার্ন ব্রাকিসেফালস ও নর্ডিক। এরমধ্যে প্রথম তিনটি এই উপমহাদেশের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বাসিন্দা। তাদের বসবাস ছোট ছোট টুকরো এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণভারতের কাডার, ইরুলা ও পানিয়ান এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ওঙ্গে ও আন্দামানিজদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নেগ্রিটো বৈশিষ্ট্য আছে। আঙ্গামী নাগা ও রাজমহল পাহাড়ের বাগাড়িদের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নেগ্রিটো বৈশিষ্ট্য ভালভাবেই চোখে পড়ে। তবে সম্ভবত তারা ভারতের অনেক পরে আরব বণিকদের সঙ্গে এসেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির বর্ণবহুল চিত্রে নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর অবদান কতটা সে ব্যাপারে কিছুই জানা নেই। তুলনায় প্রটো-অস্ট্রেলয়েড গোষ্ঠী এদেশে সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি। মধ্যভারতের বেশির ভাগ উপজাতিই এই গোষ্ঠীভুক্ত। আর্যরা (ইন্দো-এরিয়ানস) এদেরই আনস, দাস, দস্যু ও নিষাদ বলে অভিহিত করেছে, যা কিনা সবই নিন্দাসূচক বিশেষণ। মঙ্গলয়েড জনগোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করা যায়—পেলিও-মঙ্গলয়েড ও টিবেটো-মঙ্গলয়েড। হিমালয় অঞ্চল ও উত্তর-

পূর্বাঞ্চলের উপজাতিরা মঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, মনিপুর ও ত্রিপুরার মতো পূর্বভারতের রাজ্যে অনুপজাতির মানুষের মধ্যেও কিছু কিছু মঙ্গলয়েড বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই জনগোষ্ঠীগুলিকে ভারতের আদি বাসিন্দা ধরা যেতে পারে। এরমধ্যে প্রটো-অস্ট্রলয়েডরা সম্ভবত নেগ্রিটোদের পরে এসেছে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে যে সব জনগোষ্ঠী ভারতে এসেছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে মেডিটেরানিয়ানস, ওয়েস্টার্ন ব্রাকিসেফালস (তারা আবার এলপাইনয়েড, দিনারিক ও আর্মেনয়েড, এই তিন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত) এবং নর্ডিকরা (ইন্দো-এরিয়ানস)। দ্রাবিড়ীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মেডিটেরানিয়ানদের আত্মীয়তা রয়েছে মনে করা হয়। তেমনই এলপাইনয়েড ও দিনারিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে। পার্সি বা পারসিকরা আর্মেনয়েড গোষ্ঠীভুক্ত। নর্ডিকরাই হল সবচেয়ে বড় জাতিগোষ্ঠী যারা ভারতে এদের পরে এসেছে, কিন্তু এদেশের সমাজ এবং সংস্কৃতিতে বিরাট ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু তারা আসার আগেই এদেশে একটি সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, যা ইন্দাস ভ্যালি বা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভারতে আগমন ও আর্যদের এদেশে আসার আগেই সিন্ধু সভ্যতার উদয়ের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল তা নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রচলিত তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও মত নিয়ে এখন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এক শ্রেণীর গবেষক মনে করছেন, আর্যদের ভারত আক্রমণের তত্ত্বের পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তাঁদের আরও দাবি, সিন্ধু সভ্যতা তৈরি হয়েছিল আর্য ও আর্য-পূর্ব মানুষের যৌথ প্রয়াসে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ এস. আর. রাও, যিনি লোথাল এলাকায় গবেষণার জন্য বিখ্যাত। একাধিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তিনি দাবি করেছেন, সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা আদতে কোনও একটি জাতির মানুষ ছিলেন না, বহু জাতির সমন্বয়ে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাঁর দাবি, লোথাল এলাকায় বিস্তারিত খননকার্য চালিয়ে সামান্য যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিতবাহী। তাঁর আরও যুক্তি, সভ্যতা মাত্রই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। তাই সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে তিনি ওই দাবি তুলেছেন।

এখানে অবশ্য সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার রূপরেখা দিতে গিয়ে প্রচলিত মতকেই অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, বিরুদ্ধমত যা রয়েছে, তা এখনও যথেষ্ট যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বলে অবশ্য তা হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে না। এমনও হতে পারে, ভবিষ্যতে ভারতের প্রথম নগর সভ্যতার ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।

সিন্ধু সভ্যতা প্রধানত মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা (দুটো শহরই এখন পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে পড়েছে), এই দুই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এই দুই জায়গাতেই

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল। পরে অবশ্য ব্যাপক খননকার্যের সুবাদে জানা গিয়েছে, এই সভ্যতা আরও অনেক বড় জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। কোট ডিজি (সিন্ধ, পাকিস্তান), কালিবাঙ্গান (রাজস্থান), রোপার (পঞ্জাব, ভারত) এবং লোথাল (গুজরাত)-এ খনন করে সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। লোথাল বন্দরনগরী হওয়ায় তার বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে।

মনে করা হয়, সিন্ধু সভ্যতার উদয় হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব 2500 বছর আগে। খ্রীষ্টপূর্ব 2300 বছর আগেই এই সভ্যতা উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব 1700 বছর আগেই তার পতন শুরু হয়ে যায়। খননের ফলে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মিলেছে তা থেকে প্রটো-অস্ট্রলয়েড, মেডিটেরানিয়ান, এলপাইন ও মঙ্গলয়েড জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত। কোনও সন্দেহ নেই, এই সব জাতিই ওই সভ্যতাকে পুষ্ট করেছিল। এটি ছিল পুরোদস্তুর নগর সভ্যতা, যার নগর-নির্মাণ পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নগরগুলি বেশ খোলামেলাভাবে তৈরি, বাড়িঘরের পরিসর বেশ বড়সড় এবং তা তৈরি করতে খুবই মজবুত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল। বৃষ, মহিষ, উট, হাতি প্রভৃতি বেশ কয়েকটি জানোয়ারই যে তারা পোষ মানাতে শিখেছিল, এমন সাক্ষ্যপ্রমাণও রয়েছে। তুলো এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন হত, এবং নগরের মধ্যে বিরাট বিরাট শস্যভাণ্ডারে ওই খাদ্যশস্য মজুতের ব্যবস্থা ছিল। উপমহাদেশের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা ভালই ব্যবসাবাণিজ্য করত, এছাড়া পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও সুদূর মেসোপটেমিয়ার সঙ্গেও তাদের বাণিজ্যসূত্রে যোগাযোগ ছিল। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি নিশ্চয়ই যথেষ্ট ধন উপার্জন করে সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল, কারণ সোনা, রুপা, তামা, একাধিক মিশ্র ধাতু ও দামি পাথর বসানো অলঙ্কার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। চারু ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও ওই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। তবে, আমাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওই সময়েই ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যার কিছু রেশ আজকের দিনেও রয়ে গিয়েছে। শিব পূজা, লিঙ্গ পূজা এবং মাতৃ পূজার চল সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই শুরু। দুর্ভাগ্যবশত, আজ পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় খনন করে লিপি সম্বলিত যে সব সিল পাওয়া গিয়েছে তার অর্থ বোঝা যায়নি। ফলে, তখনকার সমাজের অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্মীয় আচারবিশ্বাস সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় নি।

আর্যরা এদেশে আরও পরে এসেছিল। এবং আসার পরে এদেশের পূর্বতন বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল। আর্যরা এদেশে কোনও নগরসভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে আসেনি। প্রধানত পশুপালনই ছিল তাদের জীবিকা। সেইসঙ্গে তাদের ছিল সহজাত কাব্যপ্রতিভা ও দার্শনিকসুলভ চিন্তা ও জিজ্ঞাসা,

এবং বহু খুঁটিনাটি আচারবিশ্বাস। এক অর্থে আর্যদের 'জাতিদ্বেষী' বলা যায়, কারণ তারা নিজেদের উন্নত জাতি বলে মনে করত এবং এদেশে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির মানুষকে তারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত। এদেশে অপেক্ষাকৃত আদিবাসিন্দাদের সম্পর্কে বিভিন্ন অবজ্ঞাসূচক নামকরণের মধ্যেই তাদের এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। আর্যরা অন্য সমাজের সঙ্গে মেলামেশা এড়াতে নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ সবর্ণের মধ্যেই বিবাহ করত। অন্য জাতের মানুষের সঙ্গে ছোঁয়াছুয়ি, একত্রভোজন ইত্যাদির ফলে কী দোষ হয়, কিভাবে জাত বিশুদ্ধ রাখা যায়, এই সংক্রান্ত আচারবিচার সম্পর্কে তাদের কিছু কিছু প্রাথমিক ধারণা ছিল। পরে এই ধারণার জেরেই ভারতীয় সমাজে বর্ণ (আক্ষরিক অর্থে, গাত্রবর্ণ বা গায়ের রঙ), ও জাতপাতের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় সমাজে জাতপাতের ধারণাটা হয়ত আর্যদের আগেই কিছুটা শিকড় গেড়েছিল। আগেকার বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে আদানপ্রদানের সময় থেকেই হয়ত সমাজে এই ধারণা শুরু হয়েছিল। আদিম জাতিগুলির সঙ্গে অন্য জাতির মানুষের বিবাহ বা যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তখন থেকেই বেশ কিছু সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ও নিয়মকানুন ছিল। পরে আর্যরা এসে ওইসব সামাজিক বিধিনিষেধকে আরও সূক্ষ্ম ও জটিল চেহারা দেয়।

আর্যদের সঙ্গে আদিবাসিন্দাদের যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্র অনেকখানি বিস্তৃত হওয়ার পরেই ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজের আদর্শগত ও সামাজিক রূপরেখা আকার পেতে শুরু করেছিল। আর্যরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, রাজন্য (যোদ্ধা ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী), ব্রাহ্মণ (পুরোহিত শ্রেণী), এবং বৈশ্য (চাষি সম্প্রদায়)। রাজন্যরা পরে ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিত হল। রাজার ক্ষমতা যে ঈশ্বরদত্ত, এই স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকারকে নিজেদের একচেটিয়া করে ফেলার সুবাদে ব্রাহ্মণও তার সামাজিক অবস্থানকে অনেকটা উপরে তুলে আনল। বৈশ্যরাও পরে ধীরে ধীরে ব্যবসাবাণিজ্যকেই নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করল। এভাবে তিন গোষ্ঠীই 'দ্বিজ' হয়ে উঠল। দ্বিজ, অর্থাৎ জৈবিক নিয়মে জন্মের পরে আবারও একবার সমাজে নির্দিষ্ট বর্ণের স্বীকৃতিপ্রাপ্তি। চতুর্থ বর্ণ হল শূদ্র। শূদ্ররা আর্যসমাজের বাইরের মানুষ। সম্ভবত, আর্য ও দাসজাতির (আর্যরা এদেশে আসার আগে থেকে যেসব প্রাচীন জাতি ছিল, তাদের অন্যতম) সংমিশ্রণে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছিল। চাষবাসকেই তারা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের দ্বিজত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ক্রমানুসারে এই চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে আরও একটি শ্রেণী ছিল। যাদের অ-বর্ণ, বা পঞ্চম বলা হত। জাত হিসাবে তাদের মর্যাদা এত নিচে ছিল ও তাদের জীবিকা এতই ঘৃণার্হ ও অস্পৃশ্য বলে মনে করা হত যে চতুর্বর্ণের তিন দ্বিজ, এমনকি শূদ্রের সঙ্গেও তাদের ছোঁয়াছুয়ি নিষিদ্ধ ছিল। সমাজের এই উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত সরলীকৃত কাঠামোয় বর্ণ ও পেশার তারতম্য অনুসারে প্রতিটি জাতের অবস্থান নির্দিষ্ট করা হত। প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই

আবার সেই বর্ণে অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী উঁচু-নিচু অবস্থান হত। বর্ণ-জাতি কাঠামো তৈরির আগে থেকেই সমাজে যে সব হস্তশিল্পী ও কারিগরদের সংগঠিত জোট ছিল, তাদের আর নতুন কোনও জাতিসংজ্ঞায় না ফেলে এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই উপযুক্ত জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন জাতিকেও এই কাঠামোর মধ্যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।

এই উপমহাদেশের যাবতীয় সনাতনী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে আর্যদের নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি অবশ্য সহজ ছিল না, এবং এই প্রক্রিয়াটি (আর্যকরণ) শেষও হয়নি। এই প্রক্রিয়ার প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। ঋগ্বেদে দশ রাজার যুদ্ধের বর্ণনা আছে। গাঙ্গেয় অববাহিকায় (Indo-Gangetic) আর্য রাজা সুদাস (Sudas) দশজন রাজার জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এটা হয়েছিল সেই সময় যখন আর্যদের কয়েকটি গোষ্ঠী পঞ্চনদ (পঞ্জাব) এলাকা ছেড়ে আরও পূর্ব দিকে সরে গিয়ে বসতির চেষ্টা শুরু করে। আগেও অবশ্য তাদের কিছু বাধা পেতে হয়েছিল। সেই বাধা এসেছিল দুর্গবাসী বা পরিখাবেষ্টিত জনপদ বাসিন্দাদের কাছ থেকে। ওই লড়াই লড়তে গিয়ে আর্যদের শেষ পর্যন্ত দেবতাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করতে হয়। সংঘর্ষ বা লড়াই চালানোর সঙ্গেই সুবিধামত সমঝোতা বা মৈত্রীর চেষ্টাও অব্যাহত থাকত। যেমন, দশ রাজার যুদ্ধ নেহাতই আর্য বনাম অনার্যের লড়াই ছিল না। সেই যুদ্ধে যক্ষদের রাজা ভেদে (Bhede) আর্য রাজা সুদাসের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে আর্যরা পশুপালন থেকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার সঙ্গেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন আরও বেশি করে দেখা দিল। এমনিতেই অবশ্য এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির সমাজের মধ্যে একটা মিশ্রণের মাধ্যমে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া চলছিলই। এটা আরও বাড়ল যখন আর্যরা পূর্বদিকে আরও বেশি এগোতে শুরু করল এবং বিন্ধ্যপর্বত পেরিয়ে মালব প্রদেশের দিকে গেল। আর আর্যদের অগ্রগতির সঙ্গেই যে সংঘর্ষ শুরু হল, তার জের থেকেই ব্রাত্য প্রথার জন্ম হল। এই ব্রাত্যরা এমনিতে অনার্য, এবং নিজেদের অনার্য পরিচয় ধরে রাখার সঙ্গেই আর্যদের কিছু কিছু সংস্কার, সামাজিক ধ্যানধারণাও তারা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। এভাবে বহু মত ও বহু সংস্কৃতির মিশ্রণে সমাজ বহু বর্ণে চিত্রিত হয়ে উঠতে থাকল।

কিন্তু আত্মীকরণের এই প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রধান বাধা দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, কয়েকটি আদিবাসী জনজাতি এই মিশ্র সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে মিশে যেতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল। এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বাসনায় ক্রমশই সমতল ছেড়ে দুর্গম বনাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকায় সরে যেতে লাগল। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জনজাতি নিজেদের স্বতন্ত্র্য চরিত্র ধরে রাখতে পেরেছে। যদিও অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে

তাদের নিষেধাজ্ঞা এখন অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে। আদিবাসীদের মতোই অন্য যে সব জাতি ও জনগোষ্ঠী নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করতে অভ্যস্ত, তারাও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা পরিমাণে বজায় রাখতে পেরেছে। এরকমই পাঁচটি কারুশিল্পী বা কারিগর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অন্ধ্রপ্রদেশে এখনও রয়েছে, যারা পঞ্চ ব্রহ্ম নামে পরিচিত। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে এরা বিবাহ করে না। এদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের নিজস্ব আচারসংস্কার আছে। এবং সেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও ভূমিকাই নেই।

দ্বিতীয়ত, আরও কয়েকটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী থেকেও এব্যাপারে বিশেষ বাধা এসেছিল। অন্ধ্রে রেড্ডিরা, কেরলে নায়ার, তামিলনাড়ুতে মারাভা, মহারাষ্ট্রে মারাঠারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এতটাই শক্তিশালী ছিল যে বর্ণব্যবস্থায় তাদের শূদ্রের দলে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই দ্বিজত্ব না পেলেও তারা ক্ষত্রিয়ের প্রায় সমমর্যাদা দাবি করে এবং পেয়েও যায়। তৃতীয় সমস্যা এল, এদেশে আর্যদের পরে আসা বহিরাগতদের কাছ থেকে। গ্রিক, সিথিয়ান, পার্থিয়ান, শক, কুষাণ ও হুণরা এদেশে এসে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা ভোগ করেছে, বসতি করেছে এবং জনজীবনে মিশে যেতেও আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু বহিরাগত হওয়ার কারণে তাদের গোড়ায় ম্লেচ্ছ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের হাতে ক্ষমতা থাকায় সামাজিক মর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি। কুষাণদের মতো কিছু কিছু বহিরাগত জনজাতি অবশ্য আস্তে আস্তে ভারতীয় সমাজে মিশে যেতে পেরেছিল। যে সব এলাকায় ইতিমধ্যেই হিন্দুধর্মের প্রভাব দুর্বল হয়ে বৌদ্ধধর্ম মাথা তুলতে শুরু করেছিল, সেই সব জায়গাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। নয়া ধর্মান্তরিতদের গ্রহণ করতে বৌদ্ধরা খুবই আগ্রহ দেখায়। তাই বৌদ্ধদের মাধ্যমে ওইসব বহিরাগতরা ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজে মিশে যেতে শুরু করে। এই ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অন্তত দুজন রাজার নাম ভারতীয় ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়—মিনান্দার (ইন্দো-গ্রিক মিলিন্দ, খ্রীষ্টপূর্ব 155-30) এবং কনিষ্ক (কুষাণ রাজা, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী)।

শকদের মতো কয়েকটি গোষ্ঠী আবার শৈব সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিল। শৈবদের, বিশেষ করে এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখার মধ্যে আচারব্যবহার, সংস্কার ও জাতের বিশুদ্ধতা নিয়ে তেমন কড়াকড়ি ছিল না। বিশিষ্ট রাজা রুদ্রদমন এই সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। মনে করা হয়, রাজপুতদের উদ্ভব হয়েছিল হুণ জাতি থেকে। এবং হিন্দুসমাজ তাদের যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করেছিল।

ভারতীয় সমাজের যে সব বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাতে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে প্রায় কোনও উল্লেখই নেই বললে চলে। দাক্ষিণাত্য সম্পর্কেও যেটুকু রয়েছে, তা নিতান্তই ছিঁটেফোঁটা। ফলে দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিবরণ অসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর মানুষদের অনেকেই তাদের নিজস্ব আদিবাসী পরিচয় অনেকখানি ধরে রাখতে পেরেছিল। কিছু গোষ্ঠী অবশ্য হিন্দু সমাজে আংশিক বা পুরোপুরি ভাবে মিশে গিয়েছে। খাসি, মিজো, নাগা আদিবাসী গোষ্ঠীর একটা বড় অংশই এখন খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। যদিও ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের আদিবাসী জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও ধরে রেখেছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন, এই (ইন্দো-মঙ্গলয়েড) গোষ্ঠীগুলি অতীতের কিরাত জাতির বংশধর। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিরাতদের সম্পর্কে অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কিরাত এলাকায় এমন কিছু সামাজিক বিশেষত্ব দেখা যায় যা দেশের অন্যত্র চোখে পড়ে না।

অসমকে ভেঙ্গে অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড রাজ্য তৈরি করার অনেক আগে এই অসম রাজ্যের মধ্যেই বহু জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সমাবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মনিপুর, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলাকে বাদ দিলে সংস্কৃতি ও জনজাতির এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পুরো এলাকাতেই রয়েছে। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষ, এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার এলাকা বিস্তৃত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাগজ্যোতিষের উল্লেখ রয়েছে, উল্লেখ রয়েছে একাধিক পুরাণেও। পরবর্তীকালে, সম্ভবত মধ্যযুগে এর নাম পালটে কামরূপ হয়। এবং ধীরে ধীরে জাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা ও তন্ত্রের দেশ হিসাবে খ্যাতি ছড়ায়। গুয়াহাটির কাছেই অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির হিন্দু ধর্মের শাক্তমতের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান বলে সুবিদিত। আরও পরে এই এলাকা অসম বলে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই নামকরণের উৎস কী ছিল, 'তা নিয়ে অনেক মত শোনা যায়। একটি মত হল উঁচু-নিচু, পার্বত্য এলাকার বৈশিষ্ট্য থেকেই অ-সম, বা অসম কথাটি এসেছে। অন্য আর এক মতে, অহম রাজবংশ থেকেই অসম নামের উৎপত্তি।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গিরিপথ ধরে বিভিন্ন সময়ে যে সব জনগোষ্ঠী বা জাতি এদেশে এসে শিকড় গেড়েছিল, তাদের আগমনের ইতিহাস ভালভাবেই লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে। কিন্তু যেটা ভাল করে জানা যায় না তা হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম পার্বত্য পথগুলি ধরে মঙ্গলয়েড জাতিরা কে কোন সময়ে ভারতে এসেছিল। অধিকাংশই এসেছিল অসম-বার্মা এলাকার গিরিপথ দিয়ে। উত্তর দিকের ভুটান, নেপাল ও তিব্বতের গিরিপথ ধরেও অনেক এসেছিল। গোড়ার দিকে বিশেষ করে বার্মা সীমান্তের গিরিপথ দিয়েই বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ জাতিগোষ্ঠী এদেশে ঢুকেছিল। এটাও হতে পারে যে কিছু কিছু জনগোষ্ঠী সমুদ্রপথে বাংলা বা বার্মায় পৌঁছে তারপরে স্থলপথে অসমে প্রবেশ করেছিল। নৃতত্ত্ববিদদের সংগৃহীত কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ ইঙ্গিত দিচ্ছে, সুদূর অতীতে নেগ্রিটো ও অস্ট্রিক জাতির মানুষেরাও সম্ভবত অসমে এসেছিল। কিন্তু তাদের

আগমনে সেখানকার সামাজিক সংস্কৃতিতে কী ধরনের প্রভাব পড়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। অস্ট্রলয়েড জাতের মানুষদের অস্তিত্ব এখন অসমে খুঁজে না পাওয়া গেলেও নৃতত্ত্ববিদরা (ফিজিকাল এনথ্রপলজিস্টরা) মনে করেন, মঙ্গলয়েডরা অসমে আসার অনেক আগেই তারা এই এলাকায় এসেছিল এবং পরে তারা মঙ্গলয়েড সমাজে পুরোপুরি মিশে যায়। অসমের চিরাচরিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সীমানার পশ্চিম প্রান্ত থেকে, অর্থাৎ ভারতের অন্য এলাকা থেকে অসমে মানুষ অনেক পরে যেতে শুরু করে। তাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় ধর্মের মানুষই ছিল। এই অভিবাসনের স্রোতের সঙ্গেই অসমকে ঘন ঘন সামরিক অভিযানের মোকাবিলা করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বহিরাগতদের অসমে এসে বসতি করার ধারা অব্যাহতই ছিল, এবং ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে এভাবেই বহু অ-অসমীয় হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী এসে অসমের জনসমষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে।

অসমে মঙ্গলয়েড জাতিগোষ্ঠীদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গেই সমাজে তাদের অবস্থান নিয়ে অনেক জটিলতা আছে। দুটিই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় ও এই নিয়ে সাধারণভাবে কিছু বলতে গেলেই সন্দেহ ও বিতর্ক দেখা দিতে পারে। তবে একটি বিষয়ে কোনও মতান্তর বা বিতর্কের অবকাশ নেই। তা হল, অসমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলয়েড জাতিগোষ্ঠীর অবদানে। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ হয়েছে নানা নতুন জিনিস গ্রহণ ও রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সমাজের উপর এই গোষ্ঠীর প্রবাহ যে ছাপ ফেলেছে তা মুখে ফেলা অসম্ভব।

অসমের এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হল বডো বা বড়োরা। এই 'বডো' নামটি থেকে কোনও নির্দিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায় না। বরং বডো ভাষায় কথা বলে, ইন্দো-বার্মিজ জাতিভুক্ত এমন বহু গোষ্ঠীকেই বডো জাতিগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয়। একদা শক্তিশালী কাচারিরা, যাদের নিজস্ব রাজত্ব ছিল, তারাও এই বডো গোষ্ঠীভুক্ত। রাভা গোষ্ঠীও তাই। এখন এই দুই গোষ্ঠীই দ্রুত হিন্দু সমাজে মিশে যাচ্ছে। বস্তুত, এদের একাংশ এখন নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দিতে শুরু করেছে। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দিচ্ছে। কোচ বংশ, এখন যারা হিন্দুদেরই একটি জাতিগোষ্ঠী, এবং অতীতে যারা অসমের একটা বড় অংশ শাসন করত, তারাও এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোচরাও এখন নিজেদের অতীত পরিচয় মুছে ফেলে নিজেদের রাজবংশী বলে দাবি করছে। ইন্দো-মঙ্গলয়েড শ্রেণীর অন্য উল্লেখযোগ্য জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে চুটিয়া, দেউরি, মিশিং ও মোরানরা রয়েছে। এরা এখন অসমের উত্তরাঞ্চলে বাস করে। অতীতে চুটিয়া ও মোরানদের নিজস্ব রাজত্ব ছিল। অন্যান্য জাতির মানুষের সঙ্গে তারা এখন অনেকটাই মিশে গেছে এবং এদের একটা বড় অংশই এখন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। অসমের

দক্ষিণ প্রান্তে বসবাসকারী কুকি-চিন গোষ্ঠী হল মঙ্গলয়েড শ্রেণীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী। বর্মী ও কাচিনদের সঙ্গে তাদের ভাষাগত মিল বেশি। এরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেনি ও নিজেদের জীবনযাত্রায় পুরনো ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার ব্যাপারে অনেক বেশি সক্রিয়। তবে এখন এদের বেশিরভাগই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ইন্দো-মঙ্গলয়েড শ্রেণীর চতুর্থ ও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নাম অহম। তাই বা শান গোষ্ঠী থেকে এদের উদ্ভব। সুদূর অতীতে এরা প্রথমে চিনের য়ুনান থেকে উত্তর বার্মায় সরে এসেছিল বলে মনে করা হয়। সেখান থেকে এদের একটা শাখা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অসমে প্রবেশ করে। অসমে তারা যে শক্তিশালী রাজত্ব স্থাপন করেছিল, তার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে বুরাঞ্জিতে। বুরাঞ্জি হল অহম রাজবংশের পুরোহিত শ্রেণী বা অভিজাত শ্রেণীর তৈরি ঐতিহাসিক কালপঞ্জীর দলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশরা তাদের রাজ্য দখল করার আগে পর্যন্ত অহমরা রাজত্ব চালিয়েছিল। অন্য জাতিকে নিজেদের সমাজে ঠাঁই দিয়ে, এবং নিজেরাও ইচ্ছেমত অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করার সঙ্গেই অহমরা স্থানীয় ভাষাকেও গ্রহণ করেছিল। এভাবে ক্রমশ তারা হিন্দু হয়ে যায়। শান গোষ্ঠীর অন্যরা যেমন খামিয়াং, খামতি, টুরাং, আইতন, ফাকিয়াল প্রভৃতি অনেক পরে অসমে এসেছিল। তাদের ভাষা তাই-পরিবার ভুক্ত। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বর্মীদের প্রভাব তাদের উপর অনেক বেশি। ধর্মীয় বিশ্বাসে তারা ছিল বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্ম তারা গ্রহণ করেনি। ভারতের হিন্দু সমাজে কী ভাবে একের পর এক ভিনদেশি জাতি ও জনগোষ্ঠী এসে মিশেছিল, অসম তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অসমের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন, এবং এই অঞ্চলের হিন্দু সমাজের রূপান্তর যিনি ঘটিয়েছিলেন, তিনি হলেন শ্রী শঙ্করদেব (1449-1569)। শঙ্করদেব ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, শিল্পী, প্রচারক ও সমাজসংস্কারক। তাঁর সময়ে অসমের সমাজ ছিল বিপর্যস্ত। বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ অসমের হিন্দুসমাজে তাদের ভিন্ন ভিন্ন আচারবিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে এসেছিল। এই সব ভিন্ন ঐতিহ্য ও প্রথা অসমের সমাজে জটিলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল। শক্তি উপাসনার প্রচলনের সঙ্গেই অসমের সমাজ নারী, সুরা ও মাংসে আসক্তিকে উদারভাবে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছিল। এছাড়াও পশুবলি (এমনকি নরবলি পর্যন্ত) ও নানাধরনের গুপ্ত আচার তখন অবাধে চলছিল। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান ও সহযানের বেশ কয়েকটি তত্ত্ব ও আচার—যা কিনা বাস্তবে যৌনাচার, জাদুবিদ্যা ও একেশ্বরবাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছাড়া কিছুই নয়, তাও অসমের সমাজে ঢুকে পড়েছিল। এবং এসবই তখনকার সমাজের নৈরাজ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। জাতিগুলি আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল নানা নিষেধ ও কুসংস্কারের বেড়াজালে। সমাজের নিচুতলার মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মীয়শিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ বস্তু। এসবেরই সংস্কারে উদ্যোগী

হন অভিজাত কায়স্থ বংশের সন্তান শঙ্করদেব। বৈষ্ণবধর্মেরই একটি পরিশীলিত রূপকে তিনি অসমের মাটিতে জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর প্রচারিত মত অনুযায়ী বলিদান ও অন্যান্য জটিল প্রক্রিয়ার পথে না গিয়ে বিশ্বাস ও প্রার্থনার মাধ্যমেই মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচারে উদ্যোগী হন। তবে সমাজ সংস্কারের উপরেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সহনশীলতার কথা প্রচার করে গিয়েছেন, এবং অনুগামীদের অন্যের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করতে উপদেশ দিয়েছেন। এটা ঠিক যে জাতিপ্রথার যাবতীয় দোষ থেকে তিনি অসমের সমাজকে মুক্ত করতে পারেননি। তবে অসমের সমাজকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিন্দুসমাজের আরও কিছু বিস্ময়কর বৈচিত্র্য আছে। যেমন মনিপুর। মনিপুর রাজ্য পাহাড়ঘেরা একটি ছোট্ট কিন্তু উর্বর উপত্যকা। মেইতেই বা হিন্দু মনিপুরীদের বসবাস এই এলাকায়। এদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে। একটা মতে এরা তাতার গোষ্ঠীর উত্তরসূরী। ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব চিন থেকে ভারতে এসেছিল। আবার অন্যমতে, পামহেইবা নামে একজন নাগা সর্দার 1714 সালে মনিপুরের রাজা হয়ে বসেন। তিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন ও কিছুটা অদ্ভুত শোনালেও 'গরিব নওয়াজ' এই পারসিক ধাঁচের উপাধি গ্রহণ করেন। 'গরিব নওয়াজ'-এর অর্থ গরিবের রক্ষক। পরবর্তী রাজারা রাজসভার ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নিজেদের জন্য ক্ষত্রিয় স্বীকৃতি আদায় করে নেন। পরে দেশের অন্যত্র ক্ষত্রিয়সমাজেরও তাঁরা স্বীকৃতি পেয়ে যান। ধীরে ধীরে তাঁরাও জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার যাবতীয় বিধিনিষেধ মানতে শুরু করেন।

মনিপুরের হিন্দুধর্ম নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আছে এবং এই ধর্মীয় পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম ভক্তি গীতি ও নৃত্যকলার জন্ম দিয়েছে। ত্রিপুরায় হিন্দু ও উপজাতীয় ধর্মাচারের সহাবস্থান ঘটেছে। সেখানে হিন্দুরা 14 দেবদেবীর উপাসনা করত। হর বা শিব, উমা (শিবের অর্ধাঙ্গিনী), হরি বা বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, পৃথ্বী (পৃথিবীর দেবতা), সমুদ্র (সমুদ্রের দেবতা), গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমালয়। দেবতাদের এই তালিকা থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। দু একটি বিচ্ছিন্ন এলাকা ছাড়া ব্রহ্মার উপাসনা অন্যত্র উঠে গেছে। এছাড়া অলিকায় অন্য যে সব দেবদেবীর নাম আছে, তাঁদের অনেকেই এখন উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের পূজ্য দেবদেবীর তালিকায় নেই। একটি কিংবদন্তী অনুসারে, বার্মার রাজার কাছে এই 14 দেবদেবীর বিরাট বিরাট মূর্তি ছিল। ত্রিপুরার রাজা বার্মায় সেনা অভিযান চালিয়ে যুদ্ধে সেখানকার রাজাকে পরাজিত করার পরে ওই দেবদেবীর মূর্তি নিজের দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু এত বড় বড় মূর্তি নিয়ে আসা দুঃসাধ্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মূর্তিগুলির শুধু মাথা নিয়ে আসা হয়। পাথরের তৈরি এই

মূর্তিগুলি ছিল প্রচণ্ড ভারি, এবং কথিত আছে এর মধ্যে 13টি ছিল সোনায় মোড়া, একটি রুপোয় মোড়া। মূর্তির পূজারীরা সবাই ত্রিপুরার উপজাতি বংশোদ্ভূত। তাঁরা কেউই ব্রাহ্মণ নন। প্রধান পুরোহিত চান্তাই নামে অভিহিত হন। তাঁর চার মুখ্য সহকারী নারায়ণ নামে পরিচিত। তাঁদের আবার আটজন অপেক্ষাকৃত নবীন সহকারী থাকে, তাঁদের গালিম বলা হয়। সারা বছর মূর্তির ওই মাথাগুলি লোহার সিন্দুকে রাখা থাকে, এবং প্রতিদিন তিনজন দেবতাকে পালা করে পুজো করা হয়। শুধু বছরে একবার 'খরচি' উৎসবের সময় জুন-জুলাইয়ে এক সপ্তাহের জন্য 14 দেবদেবীর মূর্তিই বার করে চারদিক খোলা চালার তলায় রেখে পুজো করা হয়। ওই দিনগুলিতে সেখানে ভক্তদের হয়ে গালিমরা অসংখ্য পাঁঠাবলিসহ পুজো দেয়। একটি পৃথক চালার নিচে আর একজন দেবীর পুজো করা হয়, তাঁর নাম বুড়ামা। খরচি উৎসবের সময় সন্তানাকাঙ্ক্ষী মহিলারা বুড়ামার কাছে সিন্দুর ও মোমবাতি দিয়ে প্রার্থনা করে। উপজাতিদের এই দেবীকে অন্য সবাইও পুজো করে। বলির ভাগও এই দেবী পেয়ে থাকেন। হিন্দু ও উপজাতি ঐতিহ্য কী ভাবে মিলেমিশে সম্প্রীতির সঙ্গে থাকতে পারে, তার বড় উদাহরণ ত্রিপুরা। কী করে তা সম্ভব হয়েছিল তা জানার জন্য আরও অনুসন্ধান চালানো উচিত।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজ কাঠামো মজবুত আঞ্চলিক ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদেশের আর্যদের প্রভাব পড়তে শুরু করার অনেক আগে থেকেই দক্ষিণ ভারতের সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, তামিল সমাজ খ্রীষ্টপূর্ব 200 বছর আগেই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। একটি বহু প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ 'থোলকপ্পিয়াম' (200 খ্রীষ্টাব্দ) থেকে তখনকার সমাজের গঠনকাঠামো সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়। ওই বইয়ে পার্বত্য এলাকা, বনাঞ্চল, সমতলের কৃষি এলাকা, উপকূল ও ঊষর এলাকার জনজীবন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন তামিল সমাজ কী ভাবে বিভিন্ন রাজার অধীনে ধীরে ধীরে একটি সুসংবদ্ধ তামিল সমাজ তৈরি হয়েছিল, তার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় সঙ্গম গ্রন্থাবলী (রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব 200 থেকে 200 খ্রীষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে) থেকে। ওই সব রাজাদের সাহসিকতা ও বীরত্বের জয়গানই ওইসব রচনার উপজীব্য। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মনুর সংহিতার সঙ্গে তুলনীয় এমন একটি গ্রন্থ তামিল সাহিত্যে রয়েছে। তার নাম তিরুক্কুরাল (300 খ্রীষ্টাব্দ), রচয়িতা তিরুবল্লুবর। এঁর সম্পর্কে খুব কমই জানা গিয়েছে। শুধু এঁর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, এঁর জন্ম হয়েছিল নিচু জাতে, তাঁতির ঘরে। তাঁর নিবাস ও কর্মস্থল ছিল ময়লাপুর (এখন মাদ্রাজের শহরতলি)। এছাড়া তিনি হিন্দু ও জৈন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধিগত করেছিলেন। তিরুক্কুরালে মোট 133টি অধ্যায় আছে, এবং তার প্রতিটিতে 10টি করে শ্লোক বা কুররাল আছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বইটিতে মোট 2660টি লাইন এবং 1330টি কুররাল আছে, যার প্রতিটিই

অল্পকথায় বর্ণিত, কিন্তু বাছাই করা নীতিমূলক উপদেশ। পুণ্য, বিত্ত ও ভোগবাসনা—এই তিনটি বিষয়ের উপরেই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। মোক্ষ নিয়ে গ্রন্থপ্রণেতা আদৌ মাথা ঘামাননি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য নিয়েই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সাধারণ গৃহী থেকে শুরু করে সমাজের ক্ষমতা ও প্রভাবশালী মানুষ এবং সন্ন্যাসী। সামাজিক শৃঙ্খলা ও ব্যক্তির বিকাশের দিকে নজর রেখে আচরণবিধি তৈরি করার প্রচেষ্টার সঙ্গেই আরও একটি বিষয়ের কথা সর্বদা খেয়াল রাখা হয়েছে—তার নাম 'আরাম'। 'আরাম্' হল সেই বিরাট শক্তি, যা সদাসর্বদা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও যারা সমাজের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মবিধি তৈরি করেন, তাঁদের উপর নজর রেখে চলেছে। প্রেম ও ন্যায়ের সঙ্গে 'আরাম'-এর কোনও বিরোধ নেই। বরং সত্য বা ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হলে ধনী-নির্ধন, রাজপুত্র ও সাধারণ চাষির মধ্যে তা কোনও তফাৎ করে না। তিরুক্কুরাল তামিল সাহিত্যের বেদ বা আদিগ্রন্থ হিসাবে গণ্য, এরমধ্যে সত্য ও ন্যায়নীতি সম্পর্কে মানুষ তার নিজের অন্তর্জগতের নির্দেশের প্রতিফলন খুঁজে পায়। আধ্যাত্মিক জগতের চাইতে বাস্তব জগতের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েও তিরুক্কুরাল শাশ্বত সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছে।

অনেক সময়ই ভারতীয় সমাজকে একটি গণ্ডীবদ্ধ অনমনীয় ব্যবস্থা হিসাবে মনে করা হয় ও সেভাবেই দেখানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এবং সমাজবিবর্তনের কোনও কোনও স্তরে এই অভিধা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অনেক ব্যতিক্রমও আছে। জনক রাজা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও ঋষিতুল্য কৃতির জন্য ব্রাহ্মণরাও তাঁর চরণতলে বসতে দ্বিধা করেনি। আর এক রাজা বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয় হয়েও যিনি মুনি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং বৈদিক শ্লোক রচনা করেছিলেন। এই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণপুরোহিতদের পূজা-অর্চনার অধিকার অগ্রাহ্য করে বর্ণব্যবস্থার বাইরে থাকা অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গের মানুষের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। এসবের পরেও মুনি হিসাবে তাঁর আসন টলে নি। সমাজের অত্যন্ত সাধারণ স্তর থেকে আসা সত্ত্বেও রামায়ণের রচয়িতা হিসাবে বাল্মীকি অত্যন্ত সম্মানের আসন পেয়ে আসছেন। অপর মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ধীবরকন্যার সন্তান ছিলেন। দার্শনিক ও ধর্মের ব্যাখ্যাতা বিদুর ছিলেন দাসীপুত্র। পুরাণ থেকে জানা যায়, কৃষ্ণের অন্যতম পত্নী রুক্মিনী এখনকার অরুণাচল প্রদেশের কন্যা ছিলেন। ভীম যাঁকে বিয়ে করেছিলেন, সেই হিড়িম্বা ছিলেন নাগা জাতির কন্যা। অর্জুন মনিপুর-কন্যা চিত্রাঙ্গদা ও নাগারাজ্যের কন্যা উলুপীকে বিয়ে করেছিলেন। অবশ্য এই সব কন্যাদের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে ভিন্ন কথাও পাওয়া যায় অন্য পুরাণকাহিনীতে। কিন্তু এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, যে যুগে ধর্ম ও ধর্মাচরণের মানকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরা হত, তখনও এধরনের ভিন জাতিতে বিয়ে করা সম্ভব ছিল বা বিয়ে হত বলে মানুষ বিশ্বাস করে থাকে।

একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছে। তারমধ্যে চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র প্রধান। চতুর্বেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল ঋগ্‌বেদ, এর কিছু শ্লোক খ্রীষ্টপূর্ব 1000 বছরেরও আগে রচিত বলে মনে করা হয়। সাম, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ আরও পরে রচিত বলে মনে করা হয়। ঋগ্‌বেদে সমসাময়িক ঘটনারও বিবরণী পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে আর্যদেবতাদের উদ্দেশে সবমিলিয়ে 1028টি শ্লোক আছে। বেদেরই গ্রন্থগুচ্ছ হল ব্রাহ্মণ, এবং তাতে প্রধানত পূজা-অর্চনা ও যাগযজ্ঞ, বলিদানের নিয়মবিধির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ঋগ্‌বেদের দুটি, যজুর ও অথর্ব বেদের একটি করে এবং সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। আরণ্যক হল দর্শন ও ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থগুচ্ছ। সমাজ যে আচারসর্বস্বতা থেকে ক্রমশই দার্শনিক চিন্তাভাবনার দিকে এগোচ্ছে, তার প্রতিফলন আরণ্যকে ধরা পড়ে। বেদের সূত্র ধরেই উপনিষদ এলেও সেখানে সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে একেশ্বরবাদী দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ হয়েছে। বেদাঙ্গশ্রেণীর গ্রন্থগুলি বেদেরই অনুষঙ্গ। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র কল্পবেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এরমধ্যে গৃহ্যসূত্র বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যে সব পারিবারিক আচারসংস্কারের জন্য হিন্দুরা বিশিষ্ট, তার বিধিগুলি এই গৃহ্যসূত্রেই রয়েছে। এছাড়া পুরাণগ্রন্থাদিও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মনুস্বয়ম্ভু থেকে উদ্ভবত বংশধারার কল্পিত বিবরণ ওই সব পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা থেকে মনুর জন্ম, এবং ভারতের তিনিই প্রথম রাজা। এভাবে পুরাণের কাহিনীতে বংশাবলীর বিবরণ রামায়ণ-মহাভারত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, এমনকি পৌরাণিক যুগ ছাড়িয়ে ঐতিহাসিক যুগের কয়েকটি রাজবংশের উল্লেখও পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ঠিক কোন সময়ে রচিত, তা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব 950 বছর আগে হয়েছিল। যদিও কোনও কোনও পণ্ডিত দাবি করেন, এটা আরও আগের ঘটনা, খ্রীষ্টপূর্ব 3102 বছর আগে ঘটেছিল। আর যে দুটি প্রাচীন গ্রন্থ ভারতীয় সমাজকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছে, সে দুটি হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (খ্রীষ্টপূর্ব 321-300 বছর) এবং মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা (খ্রীষ্টপূর্ব 100-200 বছর)। কৌটিল্য তাঁর বইয়ে মুখ্যত রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তবে সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যবস্থা নিয়েও 'অর্থশাস্ত্র'-এ কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মনু, তাঁর 'সংহিতা'য় সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধি দিয়ে গেছেন। মনুসংহিতাকে কাঠামো বা ভিত্তি করেই হিন্দুসমাজের অবয়ব তৈরি হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক ভেদ ও জাতপাত সংক্রান্ত বৈচিত্র থেকেই গিয়েছিল। তাই এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে মনুর বিধিনিষেধ হিন্দু সমাজের সর্বত্র একইভাবে মানা হত।

আজ যা হিন্দুত্ব হিসাবে পরিচিত, তা দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত ও সমঝোতার দ্বৈত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ নিয়েছে। 'হিন্দু' শব্দটি সম্ভবত অষ্টম

শতাব্দীতে এদেশে অভিযানকারী আরবদের মুখে তৈরি হয়েছিল। সিন্ধু নদের এপারে বসবাসকারী মানুষের পরিচয় হিসাবেই আরবরা এই বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু করে। তখন এই শব্দের কোনও ধর্মীয় অর্থ বা দ্যোতনা ছিল না। প্রাচীন ও আদি-মধ্য যুগের সাহিত্যে হিন্দু কথাটির কোনও উল্লেখ নেই। বৈদিকযুগের অনেক দেবতাকেই হিন্দু ধর্মে এসে তাদের আগের মর্যাদা হারিয়ে ফেলতে দেখা যায়। যেমন, বরুণ (বৃষ্টির দেবতা) ও বায়ু (পবন দেবতা)। তাঁরা আগের গুরুত্ব হারিয়ে এখানে নেহাৎই দিগ্‌পাল (সীমান্তপ্রহরী) হিসাবে রয়ে গেলেন। অগ্নি ও মিত্র (সূর্য) শুধু তাঁদের প্রতীকি গুরুত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে ইন্দ্রের। আগে তাঁকে দেবরাজ ও বজ্রের অধিকারী হিসাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই পরিচয় হারিয়ে গিয়ে তার জায়গায় একজন সদাপ্রফুল্ল ব্যভিচারাসক্ত দেবতার ছবি ফুটে ওঠে, যিনি স্বর্গের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে দরবার বসিয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর শক্তি এতটাই কমে গিয়েছে যে প্রায়শই তাঁকে বিপদে পড়ে বিষ্ণু ও শিবের সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়।

ঋগবেদে লিঙ্গ-উপাসকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে, এমনকি আর্য পরিমণ্ডলে তাদের প্রবেশাধিকারও দেওয়া হয়নি। কিন্তু হিন্দুসমাজের নতুন যে চেহারা ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল, তাতে শিবই প্রধান দুটি ধারার একটির উপাস্য দেবতা হয়ে উঠল। লিঙ্গপূজা অব্যাহত থাকল, এবং fertility cult (অর্থাৎ, উর্বরতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, তা শস্য ও সন্তান উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই) আরও ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দুধর্মের লোকাচারে এভাবে বহু অনার্য দেবতা, বিশ্বাস ও আচারসংস্কার জায়গা করে নিল। পূর্বভারতে হিন্দুধর্মের প্রসার এবং আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যকার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গেই হিন্দুধর্মও সর্বভারতীয় চরিত্র পেয়ে গেল। কিন্তু কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশাসন এবং কিছু সংস্কারকে সবাই বাইরে থেকে মেনে নিলেও তা স্থানিক, আঞ্চলিক ও জাতি-ঐতিহ্যকে সরাতে পারল না। কিছুটা অদলবদল করে সে সব লোকাচার আগের মতোই বহাল থেকে গেল।

হিন্দুধর্মের কাঠামো কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে গড়ে ওঠায় অনেক বিরুদ্ধমতের চিন্তাও এর পরিধির মধ্যেই মাথা তুলতে পেরেছিল। যেমন, অজীবক (Ajivika) দর্শন, যা জগৎসংসারকে পুরোপুরি নিয়তিবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল। লোকায়ত, বা চার্বাক দর্শন প্রচার করেছিল বস্তুবাদী চিন্তা ও নানা ধরণের তন্ত্রাচার। একইভাবে প্রচলিত হিন্দুমতের বিরোধিতা করেই জন্ম নেয় জৈনধর্ম, এবং তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মও এই খোলামেলা পরিবেশ থেকেই গড়ে ওঠে এবং পরে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত হিন্দুরাও অবশ্য বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর এক অবতার হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীকালে শিখধর্ম আলাদা ধর্মমত হিসাবে বিকশিত হয়। হিন্দু ও ইসলাম, দুই ধর্মেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শিখধর্ম খোলামনে গ্রহণ করেছিল। ধর্মাচারের আর একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করে ভক্তিমার্গ। ধর্মের রক্ষণশীল

দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই ভক্তিআন্দোলনের জন্ম হলেও পরে তা নিজেই কড়া অনুশাসন ও আচারবিধির জালে বাঁধা পড়ে যায়। এবং এখন সমাজে অনেকটা জাতব্যবস্থার মতোই ভক্তিমার্গীরা নিজেদের গোষ্ঠীতে আবদ্ধ।

ভারতীয় সমাজের গ্রন্থিজালকে ভাল করে বুঝতে হলে এদেশে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের দীর্ঘ উপস্থিতির দিকেও তাকানো দরকার। এই দুইয়ের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মই এদেশের মাটিতে আগে পা রেখেছিল। কিন্তু পরে এলেও সমাজে ইসলামের প্রভাব অনেক বেশি। শুরুতে এই দুই ধর্মই শান্তিপূর্ণ উপায়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরে তারা রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পায়। এদেশে আসার পরে দুই ধর্মের উপরেই স্থানীয় বৈশিষ্ট্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, অন্যদিকে, এদেশের সমাজে সাধারণভাবে দুই ধর্মেরই কিছু প্রভাব পড়েছিল। এদেশের সামাজিক বাতাবরণে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম এখানকার কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এভাবে তারাও ভারতীয় সমাজেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। তাই বহিরাগত হলেও তাদের আর বিদেশি ধর্ম বলা চলে না।

খ্রীষ্টধর্ম প্রথম এদেশে সেন্ট টমাস (50 খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাঁর সমসাময়িক সেন্ট বার্থোলোমিউ-র হাত ধরে এসেছিল বলে দাবি করা হয়। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী, জুডাস টমাসকে 20টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে হাব্বান নামে একজন ভারতীয় বণিকের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। ওই বণিক একজন দক্ষ ছুতোরের সন্ধানে ছিলেন। Acts of St. Thomas বইয়ে আছে, জুডাস টমাস নিজে ভারতে এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন, এই দায়িত্ব নেওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর নেই। তাঁর মাতৃভাষা ছিল হিব্রু, যা ভারতে ধর্মপ্রচারের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এছাড়া, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনচর্চায় ভারতীয়দের সুনামের কথা তখন বহির্বিশ্বের ভালই জানা ছিল। এই অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট তাঁকে দিব্যদর্শন দিয়ে আশ্বস্ত করেন। তা সত্ত্বেও কিছুটা দ্বিধা নিয়েই জুডাস টমাস দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। এদেশে এসে তিনি পঞ্জাবের গোনদোফোরনেস রাজার দরবারে হাজির হন এবং তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। যেহেতু রাজা তাঁকে 'দেবব্রত' উপাধি দেন ('দেবপুত্র' বা 'দেবনামপ্রিয়' উপাধি না দিয়ে), তা থেকে মনে করা হয়, সেন্ট টমাসের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তবে এসম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না মিললেও যেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা হল, সেন্ট টমাসের উদ্যোগে কেরলে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। পর্তুগিজরা যখন এদেশে প্রথম আসতে শুরু করে, ততদিনে কেরলের মোট 17টি রাজার রাজ্যেই খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে খ্রীষ্টানদের অনেক গির্জা, অন্তত 50টি জনবসতি ছিল। তাদের মোট জনসংখ্যা এক লাখে পৌঁছে গিয়েছিল। এসব তথ্যের সমর্থনে নথিপত্র পাওয়া যায়। ওইসব নথিপত্রেই আছে, গ্রীস দেশের পণ্ডিত পান্তানিয়ুস ভারতে এসে মালাবার উপকূলে বেশ কয়েকটি খ্রীস্টান জনপদ দেখতে

পেয়েছিলেন। সেন্ট টমাস যখন পঞ্জাবে ছিলেন, সেইসময়ই সেন্ট বার্থোলোমিউ পশ্চিমভারতে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। বোম্বাইয়ের কাছেই কল্যাণনগরী তখনই খ্রীষ্টানদের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা হয়। সেন্ট বার্থোলোমিউ ছাড়াও গ্রিক স্টোয়িক দর্শনের (সুখে-দুঃখে সমান উদাসীন, গ্রিক দার্শনিক জেনো-র মতানুলম্বী) অন্যতম প্রবক্তা পান্তানিয়ুস এদেশে আমন্ত্রিত হয়ে এসে কল্যাণনগরীর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও দার্শনিকদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, তা জানা যায় না।

তখনকার দেশীয় সমাজে সেন্ট টমাসের অনুগামী খ্রীষ্টানদের অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল? ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা এদেশে আসার সময়ে সেন্ট টমাসের অনুগামী খ্রীষ্টানরা দেশীয় সমাজে 'নজরানি' (Nazranis) নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয় সমাজের জাতকাঠামোয় ব্রাহ্মণদের কাছাকাছি মর্যাদা পেত তারা। সমাজে নিজেদের উচ্চমর্যাদার আসন বজায় রাখতে তারা নায়ারসহ অপেক্ষাকৃত অন্য নিচুজাতের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত। রাস্তায় দূর থেকে নিচুজাতের কাউকে আসতে দেখলেই এই নজরিন খ্রীষ্টানরা চিৎকার করে তাদের সতর্ক করে দিত, যাতে তারা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। রাস্তা না ছাড়লে নিচু জাতের মানুষকে হত্যা করার অধিকারও তাদের ছিল। সমাজের উপরমহলে সম্মান ও জায়গা পাওয়ার আগ্রহে এই নজরিন খ্রীষ্টানরা বেছে বেছে রাজন্যবর্গ ও উঁচুজাতের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাত। কোনও সন্দেহ নেই, এভাবে উঁচু জাতের দিকে বেশি করে নজর দিতে গিয়ে তারা খ্রীষ্টধর্মের মূল বাণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিককেই লঘু করে ফেলেছিল। হিন্দুরা অবশ্য এদেশের আদি খ্রীষ্টানদের বেশ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই দেখেছিল। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে পর্তুগিজরা এদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করার পর থেকেই। 1592 সালে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার যখন গোয়ায় পদার্পণ করেন, ততদিনে গোয়া খ্রীষ্টানদের বর্ধিষ্ণু জনপদে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সেখানে তখনই 14টি গির্জা এবং একশ'র বেশি ধর্মযাজক উপস্থিত। সেন্ট ফ্রান্সিস এসেই ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু গোয়ার আর্চবিশপ ডি মেনজেস মালাবার উপকূলের খ্রীষ্টানদের হিন্দু প্রভাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এই দুই বিরোধী প্রভাবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তা সবচেয়ে ভাল ধরা পড়েছে ইতালিয়ান জেসুইট পাদ্রি রবার্তো ডি নোবিলি-র জীবন ও কর্মে। রবার্তো 1605 সালে প্রথম গোয়াতে নামেন এবং 1656 সালে ময়লাপুরে (মাদ্রাজ শহরে) মারা যান। তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করতেন, গেরুয়া পোষাক পরতেন এবং খাওয়া এবং সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে হিন্দুদের জাতপাতের মতোই ছোঁয়াছুঁয়ির যাবতীয় বিচার মেনে চলতেন। ইউরোপীয় শক্তির ছত্রছায়ার বাইরে গ্রামাঞ্চলে তিনি কাজ করতেন। সেখান স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন তামিল ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা

চালানোর মতো সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। হিন্দু ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের অনেক গূঢ় বিষয়েই তিনি অবগত ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের ভিতর থেকেই তাকে জয় করার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বুঝিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে পারলে এদেশে খ্রীষ্টধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত রবার্তো ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা এদেশের দেড় লাখ মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রচার পদ্ধতি অনেকেই অনুমোদন করে নি, এবং এজন্য তাঁকে চার্চ ও স্থানীয় প্রশাসনের তদন্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এদেশে খ্রীষ্টধর্মের পরবর্তী অধ্যায় সুবিদিত, কারণ এই সময়ে ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ ও ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি শক্তি হাতে হাত মিলিয়ে চলেছিল। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে খ্রীষ্টান ধর্মসংঘের নানা শাখার ধর্মযাজকরা এদেশে এসে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে অনেক সমাজসেবামূলক কাজও করেছিল। কেরল ও তামিলনাড়ু ছাড়া দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু জায়গাতেই খ্রীষ্টান সমাজের মানুষজন বসবাস রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তত তিনটি উপজাতিপ্রধান রাজ্যে খ্রীষ্টানরা ভালভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যেও তারা বড় সংখ্যায় রয়েছে। বিদেশি শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য দেশীয় খ্রীষ্টানরা ভারতীয় সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু অতীতে তারা দেশীয় সমাজেরই অঙ্গ ছিল। এটা মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিম উপকূলে খ্রীষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই ছড়িয়েছিল। সেখানে উপাসনালয়ে খ্রীষ্টীয় সন্তদের মাঝে তাই বুদ্ধদেবও জায়গা পেয়ে গিয়েছেন। পহ্লবী, সিরিয়াক ও গ্রিক ভাষা থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের সুবাদেই সম্ভবত 'বোধিসত্ত্ব' রূপান্তরিত হন সেন্ট জোসাফাত নামে। ক্যাথলিকদের মধ্যেও বুদ্ধদেব সন্ত হিসাবে স্বীকৃত। এবিষয়ে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য, 'রাজপুত্র, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সেন্ট জোসেফাত-এর নামের আড়ালে বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য গ্রিক বা রোমান চার্চের লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ নেই'।

এদেশে ইসলাম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি ধারণা স্থায়ী শিকড় গেড়ে বসে আছে। এর প্রথমটি হল, নিছক অস্ত্রের জোরেই ইসলাম এদেশে প্রসার লাভ করেছিল। দ্বিতীয় ধারণা, তখন ভারতীয় সমাজ এতটাই বহুধাভক্ত ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল যে ইসলামী আগ্রাসনকে বাধা দিতে পারেনি। তৃতীয় ধারণাটিতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে দীর্ঘ সংঘর্ষের কথা বলে দাবি করা হয়, মুসলমান শাসনের সহায়তা পেয়েই ইসলাম এদেশে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। চতুর্থ আর একটি ধারণাও প্রচলিত, যাতে দাবি করা হয় যে ইসলামী শাসনকালে মুসলমান মাত্রই এদেশের অন্য ধর্মানুলম্বীদের তুলনায় বিশেষ সুবিধাভোগ করত। এই প্রতিটি ধারণাই হয় ভুল, নয় বড়জোর আংশিক সত্য।

ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রথম এসেছিল শান্তিপূর্ণ পথেই, অনেক সময়ই দেশীয় হিন্দুরাজাদের উৎসাহে। পশ্চিম উপকূলের নৃপতিরা, উত্তরের বল্লার রাজারা এবং মালাবার উপকূলের জামোরিন রাজারা মুসলমান বণিকদের তাঁদের রাজ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বসবাস করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এজন্য আনহিলওয়ারা, কালিকট ও কুইলন প্রভৃতি স্থানে তাঁদের বসবাসের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তারা বিনা বাধায় মসজিদ নির্মাণ এবং নিজেদের ধর্মানুচরণ করতে পারত। আরব ও পারসিক অভিবাসীরা উপকূল এলাকা ধরে নিজেদের জনবসতি গড়ে তুলেছিল ও স্থানীয় অ-মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। এভাবে সংমিশ্রণের ফলেই কোঙ্কণের নওয়াইত ও মালাবার উপকূলের মোপলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। লোককথায় ও জনশ্রুতিতে এদেশে ইসলামের আগমনের আরও অনেক প্রাচীনত্ব দাবি করার চেষ্টা হলেও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী অষ্টম শতাব্দীতেই এদেশে প্রথম মুসলমানরা এসেছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় পর্যটক ইবন বতুতা এদেশে এসেছিলেন। মালাবারে গিয়ে তিনি বহু শহরেই অসংখ্য ধনী মুসলমান বণিকের দেখা পেয়েছিলেন। তারা সেখানে জমকাল সব মসজিদও তৈরি করেছিল। তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলে লাব্বাই সম্প্রদায় আছে। মনে করা হয়, জাহাজডুবির পরে ভেসে আসা বা নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় নেওয়া ইরাকীদের সঙ্গে স্থানীয় তামিল মেয়েদের সংমিশ্রণে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল।

যে সব ভ্রাম্যমান প্রচারক এদেশে ইসলামের বাণী প্রচার করতে এসেছিলেন, তাঁদের অবদানের কথাও মনে রাখা দরকার। এদেশে ইসলাম ধর্মের শান্তিপূর্ণ প্রসারে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই ধর্মপ্রচারকরা একাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এদেশে আসতে শুরু করেন। তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই ভারতে এসেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত, কিন্তু ধর্মপ্রচারে উৎসাহ সবারই প্রবল ছিল। বিদেশী আক্রমণকারীরা সঙ্গে করে এদেশে খুব সামান্য সংখ্যক ধর্মপ্রচারককেই এনেছিল।

এদেশে সবচেয়ে আগে যে কজন মুসলমান ধর্মপ্রচারক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বোখারার শেখ ইসমাইল অন্যতম। ইনি 1105 সালে এদেশে এসে লাহোরে বসবাস করেন। ধর্মশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁর কথা শ্রোতাদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলত। ইয়েমেন থেকে 1067 সালে এসেছিলেন আবু আল্লা। তিনি গুজরাতে ধর্মপ্রচার করেন এবং মনে করা হয়, এদেশে বোরা সম্প্রদায়ের তিনিই প্রথম প্রচারক। এধরনের প্রচারকদের নামের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া যায়। তবে এখানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ তেমন কয়েকজনেরই নামোল্লেখ করা হচ্ছে, সমাজে যাঁদের অবদানের রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে। এঁদের একজন নুর-উদ-দিন—যিনি নুর সদাগর নামেই বেশি পরিচিত। হিন্দু মানসিকতাকে সম্মান জানাতেই তিনি নিজের জন্য এই নামকরণ করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি পারস্য থেকে গুজরাতে এসেছিলেন এবং খোজারা তাঁকে

তাদের সম্প্রদায়ের প্রথম ধর্মপ্রচারক বলে মনে করে। বুখারার সৈয়দ জালাল-উদ-দিন। (1190-1291 সাল) ও তাঁর শিষ্যবর্গ প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশে এবং পরে পঞ্জাবে ধর্মপ্রচার করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন অবশ্যই খ্বাজা মুইন-উদ-দিন চিস্তি। পারস্যের পূর্বাঞ্চল থেকে এসে তিনি আজমির শহরে বাস করেন এবং সেখানেই 1236 সালে তাঁর দেহান্ত হয়। এখনও তাঁর দরগায় নিয়মিত ভারত-পাকিস্তান দুদেশ থেকেই বিরাট সংখ্যক ভক্তসমাগম হয়। তাঁর ভক্তদের মধ্যে শুধু মুসলমান নয়, অন্য ধর্মের মানুষও রয়েছে। একই শতাব্দীতে বু আলি কালান্দার এদেশে এসে পানিপথে ডেরা বাঁধেন। রাজপুতদের মধ্য থেকে তিনি বহু মানুষকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। বাংলাদেশেও (অবিভক্ত বাংলা) বহু মুসলমান সন্তের কবর ও মাজহার রয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কয়টির অন্যতম হল শেখ জালাল-উদ-দিন তারবিজি-র দরগা। তাঁর কবর ঠিক কোথায়, তা জানা যায় না। তবে তাঁর স্মৃতিতে তৈরি দরগা এখনও বহাল এবং প্রতি বছরই সেখানে বিরাট সংখ্যক ভক্ত-দর্শনার্থীর ভীড় হয়।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পঞ্জাব, কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্য, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে বহু ধর্মপ্রচারক ইসলাম প্রচারে সক্রিয় ছিলেন। এঁদের মধ্যে বাবা ফরিদ-উদ-দিন ও আহমদ কবীর (মখদুম-ই-জাহানিয়ান নামেও পরিচিত) বেশি উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই পঞ্জাবে ধর্মপ্রচার করেন। কাশ্মীরে ছিলেন বুলবুল শাহ্। দাক্ষিণাত্যে ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে মহম্মদ গিসু দারাজ ও পীর মহাবীর খামদয়াত যথেষ্ট বিখ্যাত হয়েছিলেন। নামের তালিকা সহজে শেষ হওয়ার নয়। কারণ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এধরণের মুসলমান পীর-সন্তদের অসংখ্য কবর ও পীঠস্থান এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। যেটা এখানে মনে রাখা দরকার, তা হল, এই সব পীর ও ধর্মপ্রচারকরা মুসলমান শাসকদের সাহায্য ছাড়াই প্রেম ভালবাসার জোরে এদেশে ইসলামের বাণী প্রচার করেছিলেন। কোনও সন্দেহ নেই, অস্ত্রের জোরেও বহু মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এবং তার প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধবিগ্রহের সূচনাও হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমান পীর-সন্তরা মানুষকে বুঝিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করায় এখনও অন্য ধর্মের মানুষের মনে এঁদের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি রয়ে গিয়েছে।

ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশ বছরের মধ্যেই ইসলাম এক বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনা যাত্রা করার একশ বছরেরও কিছু আগেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা একদিকে চীন সীমান্ত, অন্যদিকে স্পেনের অতলান্তিক উপকূল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মুসলমান শাসনের এই সাম্রাজ্যবিস্তার পর্বে কিন্তু ভারতে মুসলমানরা তেমন উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে নি। 912 খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু প্রদেশ জয় করার সঙ্গেই গুজরাত, মালব ও ব্রোচ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। গোড়ায় কয়েকটি যুদ্ধ জিতলেও শেষ পর্যন্ত তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। মালবদেশ

জয় করার চেষ্টা প্রতিহত করেন গুর্জর রাজা নাগভট্ট। তিনি কাশিমকে যুদ্ধে পরাজিত করে পিছু হঠতে বাধ্য করেন। কয়েক বছর পরে, 731 খ্রীষ্টাব্দে কাশিম-এর উত্তরাধিকারী তানিম মালব-কে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গিয়ে দাক্ষিণাত্যের একাংশ দখল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু চালুক্যরাজার হাতে তাকেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হয় (738 খ্রীষ্টাব্দ)। ঐতিহাসিক কে এম পানিক্কর মনে করেন, ওই যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারত পরবর্তী 275 বছর সুরক্ষিত থাকতে পেরেছিল এবং অন্তর্বর্তী সময়ে তেমন শক্তিশালী কোনও বহিঃশত্রু এদেশে হামলা চালাতে আসেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম 883 খ্রীষ্টাব্দে কচ্ছের উপর ইমাম বিন মুসার আক্রমণ। সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তা মিহিরভোজ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

পর পর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে প্রায় তিনশ বছর ধরে এদেশে ইসলামী শক্তির আগ্রাসন পরিকল্পনা বেশ কিছুটা ব্যাহত ছিল। কিন্তু পরে আর তাদের ঠেকানো যায় নি। বিশ্বের অর্ধেক দেশে যা আগেই ঘটেছিল, ভারতে তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে যে সব বিদেশী মুসলমান অভিযান হয়েছিল, এবং যে সব মুসলমান বংশ বেশ কয়েকশ বছর ধরে দিল্লি ও আগ্রা থেকে দেশে রাজত্ব করেছিল—তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে।

712	খ্রীষ্টাব্দ—	আরবদের সিন্ধুবিজয়
997-1030	,,	গজনির মহম্মদের (তুর্ক বংশোদ্ভূত) পর পর অভিযান
1192	,,	মহম্মদ ঘোরির (তুর্ক-আফগান) হাতে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়
1206	,,	কুতুব-উদ-দিন আইবকের (তুর্ক-আফগান) দাসবংশ প্রতিষ্ঠা
1296-1316	,,	আলা-উদ-দিন খিলজির রাজত্বকাল
1325-51	,,	মহম্মদ বিন তুঘলকের (তুর্ক-আফগান) রাজত্ব
1414-50	,,	দিল্লিতে সৈয়দবংশের রাজত্ব (প্রথম সৈয়দ সুলতান তৈমুরের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন)
1451	,,	বহলুল লোদি ক্ষমতাসীন (আফগান বংশোদ্ভূত লোদিরা 1526 পর্যন্ত রাজত্ব করে)
1526	খ্রীষ্টাব্দ—	প্রথম পানিপথ যুদ্ধ, বাবরের হাতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মঙ্গোলরা এবং 1398 খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর এদেশে বড় আকারের অভিযান চালিয়েছিল)।

গজনির সুলতান যখন ভারত আক্রমণ করে ততদিনে এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ভারতের সার্বিক প্রতিরোধক্ষমতা তখন অনেক কমে এসেছে। তারই মধ্যে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কিছু সাহসিক প্রচেষ্টা হয়েছিল। যেমন, গজনির সুলতান পবিত্র সোমনাথ মন্দির লুঠ করে ফেরার সময়ে ধার রাজ্যের পারমার বংশের রাজা ভোজ কাথিয়াওয়াড়ে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, গজনির সুলতানকে ঘুরপথে অনেক কষ্ট স্বীকার করে একেবারে জলশূন্য মরুএলাকার মধ্য দিয়ে নিজদেশে ফিরতে হয়। আগেই দেখেছি, ভারতে অতীতেও বহু বিদেশী আক্রমণ হয়েছে। শক, কুষাণ ও হূণরা এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে, এবং প্রাথমিক শত্রুতার পরে তারা অবশ্য এদেশের সমাজেই মিশে যায়। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা অনেক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী তিক্ত সম্পর্কের জন্ম দিয়েছে। কারণ, তারা সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গেই এদেশে নিজেদের ধর্মতত্ত্বও নিয়ে এসেছিল। এছাড়া একমাত্র ইসলামকেই তারা সত্য ধর্ম বলে মনে করত। ফলে, সমাজে একটা বিভেদ দেখা দিল। একই সঙ্গে অবশ্য একটা আপোষ-সমঝোতার চেষ্টাও চলেছিল। কিন্তু এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটানো ছাড়া মুসলমান শাসকদের অন্য লক্ষ্যও ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি আন্তরিকভাবে গোটা সমাজকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল। ফলে কারও কারও আমলে বিধর্মীদের উপর (বিশেষত হিন্দুদের উপর) জিজিয়া করের মতো বৈষম্যমূলক কর চাপানো হত। জমি ও সম্পত্তির উপর 'খরাজ' করের অধিকন্তু এইসব বাড়তি কর গোঁড়া ইসলামী শাসকরা কেউ কেউ জোর করে চাপিয়ে দিত। আবার অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবাপন্ন মুসলমান শাসকের আমলে এইসব বৈষম্যমূলক করের বোঝা হালকা করা হত।

ইসলামী ধর্মতত্ত্বের বিচার অনুসারে অবশ্য ইসলামী মুসলমান শাসনাধীন দেশের বিধর্মী প্রজাদের সামনে তিনটি পথ খোলা রয়েছে। তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে পারে, ধর্মগ্রহণ না করলেও ইসলামী শাসনকে মেনে নিয়ে 'ধিম্মি' (Dhimmls) শ্রেণীভুক্ত হয়ে জিজিয়া ও খরাজ কর দিতে পারে। অথবা সরাসরি লড়াইয়ের রাস্তায় নামতে পারে। নিয়মানুযায়ী অবশ্য একমাত্র সেইসব ধর্মের অনুগামীরাই 'ধিম্মি' শ্রেণীভুক্ত হওয়ার অধিকারী, যাদের ধর্মগ্রন্থ সরাসরি ঈশ্বরাদিষ্ট বাণীর ভিত্তিতে রচিত। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলে 'আহ্ল-উল-কিতাব', একমাত্র তারাই 'ধিম্মি' হতে পারে। হিন্দুরা এই 'আহ্ল-উল-কিতাব' শ্রেণীভুক্ত নয়। ফলে, তাদের সামনে তিনটির বদলে দুটি বিকল্প ছিল—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা বা লড়াইয়ের ময়দানে মৃত্যু বরণ করা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল, দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনাধীন থাকা সত্ত্বেও দেশের অধিকাংশ মানুষই হিন্দু থেকে গিয়েছে। ইসলাম ধর্মের নিয়মবিধি এদেশে কড়া হাতে কার্যকর করা হলে এটা সম্ভব হত না। তাই দেখা যায়,

মুসলমান রাজত্বের এক আমলে জিজিয়া কর বসানো হলে অন্য শাসকের আমলে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। আবার কোনও ধর্মোন্মাদ শাসক ক্ষমতায় এসেই পুনরায় জিজিয়া কর চালু করেছে। বাস্তবে, ইসলাম ধর্মও এদেশে এসে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়ায় পড়ে ছিল। ফলে কিছু কিছু ভারতীয় বৈশিষ্ট্য তারমধ্যেও ফুটে উঠতে শুরু করে। ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান বেশি ঘটে শিল্পকলা, স্থাপত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা, শাস্ত্র, এবং জ্ঞানচর্চার আরও কিছু ক্ষেত্রে। আকবরের মতো শাসকরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের সেতু তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যান। ধীরে ধীরে একটি 'মিশ্র সংস্কৃতি' বিকশিত হতে শুরু করে।

মনে রাখতে হবে, এদেশের হিন্দুরাজারা কখনই একেবারে লোপ পায় নি। সুলতান যুগে বিজয়নগরের হিন্দুরাজা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আরও কয়েক জায়গায়, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে, অ-মুসলমান রাজারা আধিপত্য বিস্তার করে অনেক সময়ই স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিল। মুঘল আমলে রানা প্রতাপের মতো কোনও কোনও লড়াকু রাজা নতিস্বীকার করতে বেঁকে বসে। অন্যরা মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আপসরফা করলেও নিজেদের রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তারা অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করেছিল।

তখনকার সমাজে মুসলমান মাত্রই কী হিন্দুদের তুলনায় বেশি সুবিধা পেত? ধর্মীয় বিধি অনুসারে, ঐস্লামিক দেশে মুসলমান মাত্রই নাগরিক হতে পারে, যা অন্য ধর্মানুলম্বীরা পারে না। কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যেই অনেক শ্রেণীবিভাগ রয়ে গিয়েছে। যেমন আসরফ (যারা বিদেশি বংশোদ্ভূত) এবং আজলফ (যারা নিচু জাতের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত) বিভেদ। মুসলমান সমাজের নিচু তলায় আজলফিদের অবস্থান নির্দিষ্ট। দেখা গিয়েছে নিচু জাতের বহু হিন্দুই ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার পরেও সমাজে তাদের জাত-মর্যাদা বাড়াতে পারে নি। ছেড়ে আসা সমাজের তুলনীয় স্তরেই মুসলমান সমাজে তাদের জায়গা নিতে হয়েছে। হিন্দুদের একাংশ অবশ্য মুসলমান শাসকদের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিতে পেরেছিল। এদের কেউ কেউ সেনাবাহিনীর সেনাপতিও হয়েছিল। গরিব মুসলমানরা দুদিকেই বঞ্চিত ছিল। রাজার ধর্মের অনুগামী হওয়ার মানসিক তৃপ্তি তাদের জোটে নি। অন্যদিকে, আর্থিক-সামাজিক দিক থেকে তারা আগের মতোই অনগ্রসর ও শোষিত পর্যায়ে থেকে যায়।

এদেশের মুসলমান শাসকরা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পারস্পরিক সহনশীলতা ও বোঝাপড়া অক্ষুন্ন রাখার গুরুত্ব বুঝত। বাবর তাঁর ব্যক্তিগত উইলে পুত্র হুমায়ুনকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—

"হে পুত্র, ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, কারণ

সমস্ত রাজার রাজা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এদেশ শাসনের দায়িত্ব তোমার হাতে ন্যস্ত করেছেন। ফলে তোমার কর্তব্য—

(ক) ধর্মীয় পক্ষপাত যেন তোমার মনকে প্রভাবিত না করে, এবং বিচার যেন নিরপেক্ষ হয়। বিচারের সময় সব ধর্মের দেশাচার-সংস্কার ও সংবেদনশীল দিকগুলি উপেক্ষা করলে চলবে না।

(খ) বিশেষ করে, গো-হত্যা থেকে বিরত থাকবে। এর ফলে তুমি ভারতীয়দের হৃদয় জয় করতে পারবে। ভারতবাসী তাহলে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে।

(গ) কখনও কোনও ধর্মেরই উপাসনাস্থল ধ্বংস করবে না এবং সর্বদা ন্যায়পরায়ণ থাকবে, যাতে রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে, দেশে শান্তি বজায় থাকে।

(ঘ) অত্যাচারের বদলে প্রেম ভালবাসার অস্ত্রের জোরেই এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটান সহজ হবে।

(ঙ) শিয়া-সুন্নি বিরোধকে সর্বদা এড়িয়ে চলবে। না হলে, ইসলাম ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়বে।

(চ) প্রজাদের ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যকে প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্র্যের মতো মনে করে সেই দৃষ্টিতে দেখলে রাষ্ট্রপরিচালন নীতি কলুষমুক্ত থাকবে।"

মধ্য এশিয়া ছাড়া অন্য দিক থেকেও বিদেশি শক্তিরা ভারতে এসেছিল 1499 সালে পর্তুগিজরা নৌশক্তি হিসাবে ভারতীয় দরিয়ায় আবির্ভূত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ছোট ছোট এলাকায় তারা বসতি করলেও সমুদ্র বাণিজ্যের একটা বড় অংশই ছিল তাদের হাতে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় অল্প ব্যবধানে পর পর এসে হাজির হয় ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। কিছু পরে ফরাসিরাও এসে যায়। একাধিক কারণে ওলন্দাজরা পরে আরও পূর্বদিকে সরে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসে। 1614 সালে তারা মালাক্কা (এখন মালয়শিয়া) এবং 1659 সালে সিংহল (এখন শ্রীলঙ্কা) দখল করে। ইংরেজরা এদেশেই উপনিবেশ বিস্তার করে জাঁকিয়ে বসে এবং শাসনব্যবস্থার রকমফের হলেও 1947 সালের 14 আগষ্ট পর্যন্ত এদেশে রাজত্ব করে। তুলনায় এদেশে ফরাসি হস্তক্ষেপ ও তার প্রভাব অনেক সীমিত।

রাজ্য শাসন বা দেশ গঠনের ক্ষেত্রে এদেশে পর্তুগিজরা কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেনি। তবে তাদের অধিকৃত এলাকায় ধর্মাচার, রন্ধনশিল্প, সঙ্গীত ও নানা লোক উৎসবের উপর অবশ্যই পর্তুগিজ প্রভাব পড়েছিল। গোয়ানিজ সংস্কৃতির বর্তমান অবয়ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। যদিও ভিন্ন সংস্কৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে গোয়ানিজরাও যথেষ্ট

সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছিল। ফরাসিদের প্রভাব তাদের ছোট ছোট উপনিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র ইংরেজদেরই উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য, এবং তার ভাল-মন্দ দু'রকম প্রভাবই বিশেষ ভাবে পড়েছিল। গোড়ার দিকে ইংরেজরা দেশীয় মানুষের সঙ্গে বেশ কিছুটা মেলামেশা করে। দেশীয় অভিজাত সমাজের অনুকরণে অনেক ইংরেজ রাজপুরুষই তখন 'নবাবি' আদবকায়দা রপ্ত করতে বাঈ নাচ থেকে শুরু করে দেশী রক্ষিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরে তাদের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়ায় তাদের জীবনযাত্রা ক্যান্টনমেন্ট ও ক্লাবে নিজেদের মধ্যে মেলামেশায় সীমিত হয়ে যায়। দেশীয়দের সঙ্গে আগের মতো অবাধ মেলামেশা তারা আর করত না। একবার এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসার পরে ইংরেজরা এদেশকে নির্বিচারে শোষণ করতে শুরু করে। ফলে এ দেশের সম্পদ তাদের দেশে পাচার হয়ে যেতে থাকে। দেশীয় হস্তশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। দেশীয় প্রজাদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত শ্রেণী তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরেজরা নতুন জমিদার শ্রেণীর জন্ম দেয় এবং সিভিল সার্ভিস বা আমলাতন্ত্রের মাঝারি ও নিচু তলায় দেশীয়দের চাকুরি দেয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগতদের খুশি রাখতে নানা ধরণের খেতাব-উপাধি, সম্মান ও সনদ বিলির জটিল ব্যবস্থার প্রচলন হয়। স্থানীয় সামাজিক আচারব্যবস্থায় ইংরেজরা কমই হস্তক্ষেপ করত। শুধু সতীদাহ বা ঠগী প্রথার মতো কু-প্রথা নিবারণেই তারা উদ্যোগী হয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল। ইংরেজ আমলে একদিকে অভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও দেওয়ানি আইন; অন্যদিকে রেল যোগাযোগের সুবাদে গোটা দেশ সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়। বিদেশি শাসনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয়রাও নিজেদের আত্মপরিচয় সচেতন হতে শুরু করে এবং তারই জের হিসাবে ভারতীয় রেনেশাঁ দেখা দেয়। রাজভক্ত আমলা তৈরি করার জন্য ইংরেজরা এদেশের যে শ্রেণীকে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিল, সেই ইংরেজি শিক্ষিত দেশি বুদ্ধিজীবীরাই নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে তারাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হয় ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ভারতীয় সমাজও তার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দোষত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হতে শুরু করে। সমাজে এক নতুন সংস্কার ও সামাজিক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে।

দুই

বৈচিত্র্য ও ঐক্য

ভারতীয় সমাজের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহু ব্যবহারে জীর্ণ এই অভিধাটিই ভারতে আত্মপরিচয়ের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদূর অতীতে মেগাস্থিনিস (খ্রীষ্টপূর্ব 315 বছর), ফা-হিয়েন (405-11 খ্রীষ্টাব্দ), হিউয়েন সাঙ (630-44 খ্রীষ্টাব্দ), আল বেরুনি (1030 খ্রীষ্টাব্দ), মার্কো পোলো (1288-93 খ্রীষ্টাব্দ) এবং ইবন বতুতা (1325-51 খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ বহু বিদেশি পর্যটক এদেশে এসে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে সে কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। দেশ বিভাগের দরুণ সিন্ধুসভ্যতার বিখ্যাত সব জায়গাই (মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি) ভারতের বাইরে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। একই সঙ্গে পঞ্জাব ভাগ হওয়ায়, আর্যরা এদেশে এসে প্রথম যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, সেইসব এলাকার অধিকাংশই ভারতীয় রাষ্ট্র সীমানার বাইরে চলে যায়। দেশ বিভাগের এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতে তাই বহুর মধ্যে এক বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবেগপূর্ণ ধ্বনি উঠেছে। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন, দুইয়েরই প্রতিফলন হয়েছে তার মধ্যে। এরই মধ্যে ছয় ও সাতের দশকে ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতির ভিতে কাঁপন ধরিয়ে দেয় কিছু আন্দোলন, যা আটের দশকে রীতিমত উত্তাল আকার নেয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শুরু হয়ে মাঝে কিছু দিনের জন্য তামিলনাড়ুতে, এবং আটের দশকে পঞ্জাব, অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, 'গোর্খাল্যাণ্ড', 'ঝাড়খণ্ড' প্রভৃতি বহু এলাকায় আন্দোলন ছড়িয়ে যায়। এই সব আন্দোলনই ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমুখী বৈচিত্র্যকে ধরে রাখার জন্য আরও বেশি করে যত্নবান হতে বাধ্য করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচয় যাতে নষ্ট না হয়, সে কথাও বার বার তুলে ধরা হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুত্বকে স্বীকার করা হলেও দেশকে আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্যের উৎস কোথায়? জাতি, ধর্ম ও ভাষা অবশ্যই সবচেয়ে বড় উৎস। প্রধান যে ছয়টি জাতির মানুষ ভারতীয় সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের কথা সংক্ষেপে প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার, ভারতীয় জনসংখ্যার বড় অংশই বিভিন্ন জাতির মানুষের সংমিশ্রণে তৈরি। এই

সব মানুষের রক্তে আদি জাতের সূক্ষ্ম রেশ এখনও থেকে থাকলেও বড় জোর তা জাতগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের যৌথ স্মৃতির অংশ মাত্র হয়ে রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাত-পরিচিতি বা ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে এই স্মৃতির বড় ভূমিকা রয়েছে। যেমন জাতি হিসাবে এখনকার সমাজে আর্য বা দ্রাবিড় চিহ্নিত করার চেষ্টাটাই ভুল। বরং আলাদা আলাদা ভাষাগোষ্ঠী হিসাবে আর্য ও দ্রাবিড় সংজ্ঞা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এখনও ভারতীয় সমাজে জাতি হিসাবে আর্য বা দ্রাবিড় পরিচয় দেওয়ার রীতি এতটাই প্রচলিত যে তাকে অস্বীকার করার অর্থ, সামাজিক বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য শুকনো পুঁথিগত পাণ্ডিত্য দেখানো।

জাতের ক্ষেত্রে না-হলেও ধর্মীয় বেড়াগুলি কিন্তু অনেক স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা আটটি। এই আটটি ধর্মের জনসংখ্যাভিত্তিক হিসাব—হিন্দু (82.7 শতাংশ), মুসলমান (11.8 শতাংশ), খ্রিষ্টান (2.6 শতাংশ), শিখ (2 শতাংশ), বৌদ্ধ (0.7 শতাংশ), জৈন (0.4 শতাংশ), পার্সি বা জরাথুস্ট্রিয় (0.3 শতাংশ) এবং ইহুদি (0.1 শতাংশ)। হিন্দুদের একটা বড় অংশ, প্রায় 16 শতাংশ তফসিল শ্রেণীভুক্ত। আদিবাসীরা দেশের 6.9 শতাংশ। আদিবাসীদের একটা বড় অংশ হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠ, আর একটি অংশ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তবুও নিজেদের আদিবাসী-সত্তা ও পরিচয় তারা অনেকেই বজায় রেখে চলছে। অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিতদের অনেকেই তাদের হিন্দু-অতীতের পূর্ব-সংস্কার নিজেদের আচার আচরণে বজায় রেখেছে।

প্রতিটি বড় ধর্মই আবার শাস্ত্র, সম্প্রদায় ও আচার-সংস্কার ভেদে একাধিক শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। একথা এদেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম এবং বিদেশ থেকে আসা ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হিন্দুরা মোটামুটিভাবে চারটি বড় ধর্মীয় শাখায় বিভক্ত—শৈব (শিব উপাসক), বৈষ্ণব (বিষ্ণু ও তার অবতারদের উপাসক), শাক্ত (নানা মাতৃরূপের উপাসক) এবং স্মার্ত (শিব, বিষ্ণু, মাতৃরূপ—তিনেরই উপাসক যারা)। আচারবিচারের খুঁটিনাটি প্রভেদে এই চার শাখাও একাধিক উপশাখায় বিভক্ত। এত সব শাখাপ্রশাখা ও ধর্মীয় আচার আচরণের নানা প্রকার ভেদ হিন্দু ধর্মের জটিলতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন, কবীরপন্থী, সতনামি ও লিঙ্গায়তদের দাবি অনুযায়ী তাদের কী আলাদা ধর্ম বলে মানা হবে? নাকি, জাতপাতের আদলে হিন্দু ধর্মের মধ্যেই তাদের আলাদা কাঠামো গড়ে উঠেছিল? ব্যবহারিক জীবন অবশ্য তাদের আচারবিচারেও জাতপাতের আদল পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজও একসময় নিজেদের হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক বলে দাবি করেছিল। কিন্তু এখন তাদের হিন্দুধর্মেরই ভিন্নরূপ বলে মনে করা হয়। গোড়ায় কবীরপন্থী ও আর্যসমাজীরা যা করেছিল, পরে এলেও রাধাসোয়ামি, প্রণামী ও স্বামী নারায়ণী সম্প্রদায়ও একই ভবে জাতপাতের বিচার মানতে শুরু করেছিল। গুপ্তমন্ত্র ও গুহ্য আচারের মাধ্যমে পূজা-অর্চনার

রীতি সাধারণত কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এধরণের পূজা-অর্চনার উপাসনা-পদ্ধতিগুলো ব্যক্তি বা তার পরিবারকেন্দ্রিক সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। গোপনীয়তার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তা সাধারণত গোটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ে ছড়াতে পারে না। এধরনের গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে অঘোরপন্থী, কাশ্মিরী শৈব বা অসংখ্য তন্ত্রাচারী গোষ্ঠীর উল্লেখ করা যায়। উৎসাহ না দিলেও, হিন্দু ধর্ম অবশ্যই এদের সহ্য করে এসেছে।)

ভারতের মুসলমানরা মোটামুটিভাবে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সুন্নিদের তুলনায় শিয়ারা এদেশে সংখ্যালঘু। কিন্তু তা হলেও জনসংখ্যার বিচারে ইরানের বাইরে সবচেয়ে বড় শিয়া গোষ্ঠী ভারতেই আছে। ইসলামের ধর্মীয় আইনের চারটি ভিন্ন মত প্রচলিত। তার মধ্যে ভারতীয় সুন্নি মুসলমান সমাজের অধিকাংশই হানিফি মতের অনুগামী। দাক্ষিণাত্যের মোপলা ও বিশেষ করে লাক্ষাদ্বীপের মুসলমানরা শফি মত মেনে চলে। গুজরাতের সুন্নিরা মালকি (Mallki) মতের অনুসারী। চতুর্থ মত হানবলি, যা এদেশে প্রচলিত নয়। শিয়াদের নিজস্ব ইমামী আইন আছে। আবার তারমধ্যে ভাগাভাগি রয়েছে, একদল 12 ইমামের মতানুসারী, অন্যদল সাত ইমামী ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। এছাড়া আরও 14টি ধর্মীয় উপশাখা আছে, যার মধ্যে চিস্তি ও নকশবন্দী শাখা অগ্রগণ্য। এমন অনেক শাখা আছে, যারা তেমন সংগঠিত নয়।

রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট, এই দুই ভাগে ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বিভক্ত। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন চার্চকে কেন্দ্র করে তাদের বহু শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছে। এদেশের আদি-খ্রীস্টানদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। খ্রীস্টানসমাজের মধ্যে জাতপাতের রেশ কতটা শিকড় ছড়িয়েছে, সে কথা তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।

একাধিক ধর্মের সংমিশ্রণে তৈরি শিখধর্ম সমভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করলেও জাতপাতের প্রভাব থেকে শিখ সমাজও নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারে নি। উদাহরণ স্বরূপ নিচু জাতের মানুষ শিখ ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের 'মজহবি' বলে আলাদা পরিচিতি হয়। তাদের বসবাসের এলাকা আলাদা। নিজেদের বা পাশাপাশি গ্রামেও অন্য শিখরা তাদের প্রচলিত সম্মানসূচক 'সর্দার' সম্বোধন করে না। তবে অন্য শিখদের সঙ্গেই 'মজহবি'রা গুরুদ্বারে প্রার্থনা করতে পারে এবং লঙ্গরে (গুরুদ্বার প্রাঙ্গণে যৌথ ভোজন ব্যবস্থা) অংশ নিতে পারে। তাদের অস্পৃশ্য বলে ধরা হয় না। খুশবন্ত সিংহ নিজে শিখ এবং শিখ ইতিহাস বিষয়ে একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর মতে, শিখ সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ববোধ কখনই বিবাহের ক্ষেত্রে প্রচলিত জাতপাতের বিচারকে অস্বীকার করার কথা ভাবে নি। শিখ সমাজের ভিতরেও আগেকার বর্ণভেদ অনুসারেই জাঠ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গ্রামীন কারিগর-হস্তশিল্পী শ্রেণীর মানুষরা স্বজাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে, এবং সচরাচর নিজেদের

'সমাজ' এর বাইরে তারা মেয়েদের বিয়ে দেয় না। যদিও শিখ সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে বৈষম্য থাকায় নিচু জাতের মেয়েকে উঁচুজাতের পুরুষ কখনও কখনও বিয়ে করে থাকে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তারা এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে দিতে চায় না।

একদা বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রসার লাভ করলেও বৈদিক হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গেই তার প্রভাব কমতে শুরু করে। শেষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তার উৎপত্তিস্থান ভারতের মাত্র কয়েকটি জায়গায় সীমিত হয়ে পড়ে। অনেক পরে ডঃ বি আর আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর অনুগত মাহার জাতির মানুষরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও সমাজে তাদের মর্যাদা খুব একটা বাড়ে নি। এদের 'নয়া বৌদ্ধ' বলা হয়, এবং স্পষ্টতই এরাও জাতপাতের নিরিখে দ্বিধা বিভক্ত। হিন্দুদের বর্ণভেদের চারস্তরের মতো না-হলেও ভারতীয় বৌদ্ধসমাজ দুই বর্ণের কাঠামোতে বিভক্ত। সমাজের উপরতলায় আগেকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর 'গৃহপতি' প্রমুখের অবস্থান। নিচের তলায় জায়গা দেওয়া হয়েছে আদিবাসী ও সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে। মহাযান ও হীনযান,—এই দু' ধারায় বৌদ্ধধর্মের বিভাজন অবশ্য একেবারেই তাত্ত্বিক বা দার্শনিক কারণে হয়েছিল। তার সঙ্গে বৌদ্ধসমাজের জাতপাতের কোনও সম্পর্ক নেই।

জৈনধর্মও একসময় এদেশে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখন দেশে জৈনদের সংখ্যা কম হলেও দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তাঁরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছে। এদের দুটি প্রধান সম্প্রদায়—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বর—অর্থাৎ নিরাবরণ বা বিবস্ত্র। শ্বেতাম্বর—অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্র পরিহিত। আধুনিক জৈন সমাজতাত্ত্বিক সানগাভে-র মতে, জৈন সমাজে শ্রেণী বা বর্ণ নিয়ে তেমন নিষেধের বেড়া নেই। নিজেদের পছন্দমত জৈনরা এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে, বা শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে চলে যেতে পারে। জৈন সমাজে ছোঁয়াছুয়ির বিচার বা কড়াকড়ি নেই। ভিন্ন জাত বা বর্ণের মানুষের সঙ্গে বসে তারা আহার করতে পারে। তবে জৈনদের মধ্যে কিছু কিছু জাতগোষ্ঠী আছে, যারা অসবর্ণ বিবাহ করে না। 1314 খ্রীষ্টাব্দের এক দলিলে জৈনদের একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 87 টি 'জাতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে 41টি জাতির জনসংখ্যা পাঁচশ'র চাইতেও কম। সাম্প্রতিক 1953 এক হিসেবে 60টি 'জাতি'র খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, যাদের জনসংখ্যা একশ'র চাইতেও কম। এরা সবাই সবর্ণ বিবাহের রীতিতে বিশ্বাসী।

পার্সিরা সম্প্রদায় হিসাবে আয়তনে ছোট। কিন্তু ভারতের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্সিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শতাব্দীতে পারস্য থেকে তারা প্রথম এদেশে এসেছিল। ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতেই তারা পারস্য ছেড়ে এদেশে আশ্রয় নেয়। জনশ্রুতি হল, ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে নামার পর স্থানীয়

শাসক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে পার্সিদের দলপতির বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে পার্সি দলপতি স্থানীয় মানুষদের এক গ্লাস দুধ ও একটু চিনি আনতে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী দুধ ও চিনি আনা হলে পার্সিদের নেতা দুধে চিনি মিশিয়ে দেন এবং বলেন, "দুধে চিনি মিশে গিয়ে যে ভাবে দুধের স্বাদে মিষ্টত্ব এনে দিয়েছে, ঠিক তেমন করেই আমরাও আপনাদের সমাজে মিশে যাব। এবং তার ফলও মধুরই হবে।' বাস্তবেও ঠিক তাই ঘটেছে। নিজেদের জনসংখ্যার তুলনায় ভারতীয় সমাজে পার্সিদের অবদান অনেক বেশি। ধর্মীয় আচারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ছাড়া আর সব বিষয়েই পার্সিরা পশ্চিম উপকূলের বণিক সমাজের জীবনযাত্রার রীতিনীতিকে গ্রহণ করেছে। পার্সি সমাজের বংশানুক্রমিক পুরোহিতরা তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহাদি করে। অন্য সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের একটা চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীতে করা হয়েছিল। কিন্তু প্রবল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখে সেই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

খ্রিষ্টান ও জরাথুষ্ট্রিয়ান ধর্মের মতোই ইহুদি ধর্মও এদেশের মাটিতে এক হাজার বছরেরও আগে শিকড় গেড়েছিল। এদেশের ছোট, ইহুদি সম্প্রদায়ের দুটি প্রধান বসতি ছিল। একটি কেরলের কোচিনে, অন্যটি মহারাষ্ট্রে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, মাত্র 2200 জন। কিন্তু তাদের সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার মোটেই নগণ্য ছিল না। কোচিনের ইহুদিরা জাতি বা শিবিকায় চড়ে যাতায়াত করতে পারত। যাতায়াতের সময় তাদের মাথার উপর রাজকীয় ছত্র থাকত। যাত্রাপথে আগে আগে তূর্য নিনাদ করে তাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করা হত এবং অস্পৃশ্য বা নিচুজাতের মানুষকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বলা হত। 1570 সালের এক পর্যটকের বিবরণীতে একটি মেষপালক সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, ওই মেষপালক সম্প্রদায়ের মানুষজন আদতে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মানুষদের বংশধর। এদের তখন 'সাদা ইহুদি' বলা হত। যদিও এই সম্প্রদায়ের অনেকেরই গাত্রবর্ণ ঘোরতর কালো। অন্য ইহুদিদের 'কালো ইহুদি' বলা হত। এই সাদা ও কালো ইহুদি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের চল ছিল না। মহারাষ্ট্রে ইহুদি সমাজের সদস্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, প্রায় 14 হাজার মানুষ। এখন তারা 'বেনে ইহুদি' নামে পরিচিত। আগে বহু শতাব্দী ধরে কোঙ্কনের গ্রামে গ্রামে এরা 'শানওয়ার তেলি' নামে পরিচিত ছিল। ঘানিতে তেল পেষাই এদের কাজ বা জাতপেশা ছিল এবং শনিবার এরা কোনও কাজ করত না। এমনিতে হিন্দু তেলিদের মতোই সমাজের নিচের দিকে এদের অবস্থান ছিল। শুধু একটি ক্ষেত্রেই তাদের বিশেষত্ব চোখে পড়ত। হিব্রু ভাষা ও ইহুদিদের ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না-থাকা সত্ত্বেও এই ইহুদিরা অন্য ইহুদিদের মতোই খাদ্যাভ্যাসের বিধিনিষেধ মেনে চলত। নিয়মিত ইহুদি উৎসবগুলি পালন করত। তাদের মধ্যেও 'কালো' ও 'সাদা' ভেদ ছিল

এবং তারা নিজেদের মধ্যে বিয়ে বা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এড়িয়ে চলত। কিন্তু এই ভেদরেখা থাকলেও তারা একই সিনাগগে মিলেমিশে উপাসনা করত। বোম্বাইতে এমনিতেই জাতপাতের বিধিনিষেধ অনেক আলগা হয়ে এসেছিল এবং বেশির ভাগ ইহুদিই সেখানে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পরে zionism-এর প্রভাবে এই ইহুদিদের অনেকেই ধীরে ধীরে ইজরায়েলে চলে যায়। কিন্তু মালয়ালি ও মারাঠি ভাষার পুস্তকাদি এবং অনিবার্যভাবেই মশলাপাতি আমদানির মধ্য দিয়ে তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের আর একটি সূত্র ভাষা। গোষ্ঠী পরিচয় গড়তে এবং একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের ক্ষেত্রেও ভাষার অবদান রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে 15টি ভাষা সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই সরকারি তালিকা এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার কথা ভেবে তৈরি। এমনকি সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই তালিকা অচল। সরকারি তালিকার বাইরেও আকাদেমিকে ডোগরি, ইংরেজি, কোঙ্কনি, মৈথিলি, মনিপুরী, নেপালি ও রাজস্থানীকে সাহিত্যচর্চার উপযোগী পৃথক পৃথক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। বাস্তবে, প্রতিটি প্রধান ভাষারই একাধিক আঞ্চলিক ও কথ্য রূপ পাওয়া যায়। যেমন, হিন্দির আওতায় অওয়ধি, বাঘেলি, ভোজপুরি, ব্রজভাষা, বুন্দেলি, ছত্তিশগড়ি, হাদোতি, মগধি, মালবি, নিমারি, পাহাড়ি, রাজস্থানী ও আরও অনেক আঞ্চলিক ভাষারূপ রয়েছে। তামিল ভাষারও একাধিক আঞ্চলিক ভাষারূপ আছে, যা তার সাহিত্যের ভাষা থেকে অনেকটাই আলাদা। তেলেগুর ক্ষেত্রে 'গ্রন্থিকা তেলেগু' সাহিত্যচর্চার ভাষা। অন্য সব ক্ষেত্রে 'ব্যবহারিক তেলেগু' প্রচলিত। ভারতীয় সমাজের ভাষাচিত্র আরও জটিল আকার নেয়, যখন মোট 227টি মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে ভাষার উন্নয়ন ও তার জন্য পরিকল্পনার কাজও কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু মাতৃভাষার ইস্যুটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, এবং এনিয়ে সহজেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমনকি, আদিবাসীদের ভাষাকেও অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। কারণ, একাধিক আদিবাসী-ভাষার চর্চা বেড়ে চলেছে এবং অন্তত একটি ভাষার বর্ণলিপি তৈরি হয়েছে। গণমাধ্যম ও শিক্ষার সুবাদে এই সব আদিবাসী ভাষায় যে দ্রুত গতিতে চর্চা বাড়ছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর। নাগাল্যাণ্ডের উদাহরণই নেওয়া যাক—আগে নাগাল্যাণ্ড একটি জেলা ছিল, এখন রাজ্যে পরিণত। নাগাল্যাণ্ডে 19টি ভাষার মানুষ বাস করে—অঙ্গামি (33,766/43,569), সেমা (47,439/68,227), লোথা (26,568/36,949), আও (55,904/65,275), রেঙমা (5,786/8,578), চাখেসাঙ-চোকরি/চাকরু (8.339), খেজা (7,295), সাঙটাম পোচুরি (2736). সাঙটাম (15.508/19.998), কনিয়াফ (46,653/72,338), চাঙ (11,329/15,816), ফোম (13,385/18,017), য়িমচুঙরে (10,182/13,564), খিইয়েমনামগাম (12,434/14,414), জেলিয়াঙ জেমি

(6,492), লিয়াঙমেই (2,969), কুকি-চিরু (1,175) মাফওয়ারে (769) ও টিখির (2,468)। এখানে বন্ধনীর মধ্যে ক্রমপর্যায়ে 1961 এবং 1971 সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে একটিই সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে 1961 জনগণনার হিসাব বুঝতে হবে।

ভাষার এই সংখ্যাধিক্যের জন্য আকাশবাণীর কোহিমা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত 25টি ভাষার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হয়। সংবাদ প্রচার করতে হয় 19টি ভাষায়। তার মধ্যে ইংরাজি, হিন্দি, পিজিন নাগা ছাড়াও 16টি নাগা-ভাষা রয়েছে। লঘু সঙ্গীতের বেলায় ওই 16টি নাগা ভাষার সঙ্গে আরও দুটি নাগা-ভাষার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সেইসঙ্গে ইংরাজি, হিন্দি, মালয়ালি, তামিল ও নেপালি ভাষার অনুষ্ঠানও রয়েছে। এই অবস্থায় নাগাল্যাণ্ডে সমস্ত মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে এখন 'পিজিন নাগা' ভাষা মাথা তুলছে। রাজ্যের ব্যবহারিক জীবনে দুটি ভাষার ব্যবহার এখন বহুপ্রচলিত। এমনকি সরাসরি প্রশাসনকেও একাধিক ভাষায় কাজ চালাতে হয়। এধরনের বহু ভাষাজনিত জটিলতা অন্যত্রও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে।

বৈচিত্র্যের অপর উৎস রয়েছে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে। অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভেদে মানুষের আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যই এই বৈচিত্র্য গড়ে তুলেছে। অঞ্চলভেদে পৃথক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ কীভাবে হয়? মনে রাখতে হবে, জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলির অনেকেরই নিজস্ব জাতি-গোষ্ঠীগত আচার বৈশিষ্ট্য থাকলেও তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের অন্য মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবেই প্রতিটি অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের নিজ নিজ গোষ্ঠী বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের একটা আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও একই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির মিল এভাবেই আসে। তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, তারা সবাই ওই অঞ্চলের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের অংশীদার। শক্তিশালী সাম্রাজ্য বা দীর্ঘস্থায়ী বংশানুক্রমিক শাসন এধরনের সাংস্কৃতিক অঞ্চল তৈরি করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হত, এবং বৃত্তের বাইরে দূরদূরান্তের এলাকায় কিছুটা দুর্বল হলেও ওই সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত। তবে যে সব ছোট ছোট রাজ্য সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে নিত, তাদের সংস্কৃতিতে হাত দেওয়া হত না। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের মূল সাংস্কৃতিক পরিবেশের কিছুটা ঢেউ সেখানেও এসে পড়ত। মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসেই দেখা যায়, অন্য রাজ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চরিত্র পরিবর্তনের জন্য তাদের উপর আগ্রাসী হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি তাদের পছন্দমত বৃহৎ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি থেকে নতুন নতুন উপাদান সংগ্রহ ও আত্মস্থ করে নিয়েছিল। সম্রাট অশোক ধর্মীয় বিশ্বাস ও

ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃতির অন্যান্য দিকে তাঁর হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিঙ্গে রাজা খারবেলার আমলে সেখানকার সংস্কৃতি সুসংহত রূপ নিতে শুরু করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গোড়ায় ইন্দো-গ্রিক, পরে কুষাণ এবং আরও পরে হূণদের অবদান উল্লেখযোগ্য। নর্মদা নদের দক্ষিণে সাতবাহন রাজাদের প্রভাবই বেশি পড়েছিল। কেরলের সমাজগঠনে প্রভাব ছিল চের-রাজাদের। দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র পল্লব, পাণ্ড্যিয়, বাকাতাক, চালুক্য, চোল এবং বিজয়নগরের রাজবংশের প্রভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এভাবে আরও নাম উল্লেখ করা যায়। তবে কোনও একটি রাজবংশ বা সাম্রাজ্য তার আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়ায় ঠিক কোন কোন উপাদান দিয়ে সাহায্য করেছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম শুধু তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ও কয়েকটি আচারের প্রতি আনুগত্যের দাবিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তাতে ব্যাহত হয়নি। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেশের ঐক্য ও সংহতির উপর জোর দিলেও একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক আবেগের সমর্থন পাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল। ফলে, দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি নিজের নিজের বৃত্তি সংহত হওয়ার জন্য বাড়তি উৎসাহ পেয়ে যায়।

দেশ জুড়ে ঐক্য কীভাবে এসেছিল?

উত্তরের হিমালয় পর্বতমালা ও তিন দিক ঘিরে সমুদ্রের বেষ্টনী ভারতবর্ষকে ভৌগোলিক দিক থেকে আগেই কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দিয়ে রেখেছে। ফলে, দীর্ঘদিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বর্মা ও চীনের পথে এবং সমুদ্রপথে বহিরাগতরা ভারতে খুব অল্প সংখ্যাতেই আসতে পেরেছিল। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে উপমহাদেশের মধ্যেই বহু মানুষ এক জায়গা থেকে বাস উঠিয়ে অন্যত্র বসবাস করেছে। জনসমষ্টির স্থানান্তরের সঙ্গে মেলামেশা বৃদ্ধির ফলে গোটা দেশের কিছুটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা তৈরি হয়েছে। এটা ঠিক যে, প্রাচীন কালের বৃহত্তম সাম্রাজ্যও কখনই উপমহাদেশের সর্বত্র শাসন ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হয়নি। কিন্তু তা হলেও চারপাশের এলাকায় তাদের প্রশাসনিক ও আইনী ব্যবস্থার প্রভাব অবশ্যই ছড়িয়ে ছিল।

রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘাত বা যুদ্ধ নিয়মিত ঘটনা হওয়ায় সাধারণ মানুষ ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। জয়-পরাজয়ের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রাজা ও রাজত্বের পরিবর্তন এবং ফলত সামাজিক সংস্কৃতির উপর তার প্রতিক্রিয়াও মানুষের সহ্য হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ যুদ্ধবিগ্রহই ছিল প্রতিবেশী ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে, এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিসরের মধ্যে সীমিত। তবে কিছু যুদ্ধ হত সাম্রাজ্যের এলাকা বিস্তারের উদ্দেশ্যে, এবং সেই যুদ্ধ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। সম্রাট অশোক তাঁর পরবর্তী জীবনে শান্তি ও অহিংসার বাণী প্রচারের জন্য যেমন বিখ্যাত, তেমনই তাঁর পূর্বজীবনের যুদ্ধাভিযানের জন্যও প্রসিদ্ধ। নিজের সাম্রাজ্যের

বিভিন্ন এলাকায় অশোক তাঁর উপদেশাবলী শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করে গিয়েছেন, যা এখনও দেখা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে আরও অনেক রাজার যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ আছে। যেমন, সমুদ্রগুপ্ত যুদ্ধ করতে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরম পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। যা বেশি শোনা যায় না, তা হল দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল উত্তরে অভিযান চালিয়ে গঙ্গা পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এদেশের মুসলমান শাসকরাও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে অনেক লড়াই করেছেন এবং তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও সেইসব রাজ্যে পড়েছিল।

হিন্দুধর্ম ভারতের প্রধান ধর্ম। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর হিন্দুধর্মের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। তবে এই হিন্দুধর্ম অবশ্যই অজর-অনড় নয়। বিভিন্ন সময়ে ভিতর ও বাইরে থেকে নানা প্রতিবাদী প্রভাবও এর উপর পড়েছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম একদা ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। যদিও পরে হিন্দুধর্ম এই দুই ধর্মের বিস্তারকে ঠেকাতে সমর্থ হয়, এবং পরিণতিতে জৈনধর্ম ভারতের খুব অল্পসংখ্যক জনসমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এদেশে থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবুও সমসাময়িক হিন্দুধর্মের উপর এই দুই ধর্মের প্রভাবের নানা লক্ষণ স্পষ্ট। অন্যদিকে, হিন্দুধর্ম এদেশের ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মকে প্রভাবিত করেছিল এবং নিজেও ওই দুই ধর্মের দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হয়েছিল। কোনও একটিমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থের বদলে হিন্দুধর্মের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে একগুচ্ছ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, একথা প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই সব শাস্ত্রগ্রন্থের সারমর্ম দার্শনিক, ভারততত্ত্ববিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের বাইরে বিশেষ কেউ জানেন না। এমনকি পুরোহিতরাও নয়। 'গীতা'র কিছু কিছু বক্তব্য অনেকেই জানেন। পুরোহিতরা মনুসংহিতা ও গৃহ্যসূত্রের যেমন যেমন ব্যাখ্যা করেন, সাধারণ মানুষ তাই অনুসরণ করেন। অঞ্চলভেদে এই সব ব্যাখ্যার যে রকমফের হয়, তা বলাই বাহুল্য। ফলে হিন্দুধর্ম বলে যা অনুসরণ করা হয়, তাকে প্রকৃত (classical) হিন্দুধর্ম না বলে তার জনপ্রিয় সংস্করণ বলাই ভাল। শাস্ত্রগ্রন্থের বদলে এই জনপ্রিয় হিন্দুধর্মের উৎস পুরাণ, কিংবদন্তী ও ধর্মকথা সংক্রান্ত সহজ সরল গ্রন্থ।

রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই মহাকাব্য এদেশে বহুল প্রচারিত। কিন্তু মূল সংস্কৃত ভাষায় এই দুই মহাকাব্য পড়ার চল নেই। বরং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা সংস্করণই জনপ্রিয়। সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকি রামায়ণের সূত্রে নয়, রামচন্দ্রের কাহিনী জনমানসে শিকড় গেড়েছে নানা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা রামায়ণের মাধ্যমে। রামায়ণকে ভিত্তি করে তুলসীদাস (অওয়ধি হিন্দি), কাম্বান (তামিল), পোন্না (কন্নড়) এবং অন্যান্য ভাষায় আরও অনেক কবি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। ব্যাস-এর মহাভারতও এভাবেই বহু কবি তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় নতুন করে রচনা করেছেন। কন্নড় ভাষার বিশিষ্ট কবি পম্পা তাঁর 'বিক্রমার্জুন বিজয়' কাব্যে

মহাভারতের শৌর্য-বীর্য, প্রেম-ঘৃণা, লোভ-দয়া, সন্তাপ ও হর্ষোচ্ছাস, ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও দার্শনিক চিন্তাকে অপূর্ব নৈতিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'পম্পা-ভারত' নামেই তা পরিচিত। কন্নড় ভাষার মহান কবি-ত্রয়ীর শেষজন হলেন রন্ন, যিনি একই বিষয় নিয়ে তাঁর 'সহাস-ভীম' কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থটি 'গদা-যুদ্ধ' নামেও বিখ্যাত। এই সব কবিদের রচনা বাল্মীকি বা ব্যাসের মহাকাব্যের অক্ষম অনুকরণ ছিল না। কারণ, তাঁরা রামায়ণ বা মহাভারত থেকে মূল কাহিনীর শুধু নির্যাসটুকুই নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর নিজ নিজ কল্পনা শক্তির সাহায্যে ওই কাহিনীতে রূপ-রস যোগ করে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। তুলসীদাস, কাম্বান বা পোন্নার সৃষ্ট রামচরিত্র বাল্মীকির রাম থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই তিনজনই তাঁদের কবি প্রতিভায় অনন্য ছিলেন। পম্পা তাঁর মহাভারতে অর্জুনকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করেছেন, অন্যদিকে রন্ন-র কাব্যে ভীমের যশকীর্তি প্রাধান্য পেয়েছে। ন্যায়নীতি ও দার্শনিক বক্তব্যের ক্ষেত্রেও এই কাব্যগুলিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। একই তফাৎ ধরা পড়ে তাঁদের ব্যাখ্যায় ও প্রতীক ব্যবহারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই সব কাব্যগ্রন্থই ঐশী (Divine) ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এখানে এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পম্পা ও রন্ন, এই দুই কবিই জৈনধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দ্বিতীয়জন পেশায় একজন চুড়ি-বিক্রেতা ছিলেন।

উত্তর ভারতে রামলীলা ও রাসলীলার মাধ্যমে লোকসংস্কৃতিতে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা মূর্ত হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণে, কর্ণাটকের যক্ষগান ও কেরলের কথাকলিও ধর্মীয় ভাবনাকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছে। বাস্তবিক, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নেওয়া নানা কাহিনী, বিশেষ করে কৃষ্ণকে ঘিরে তৈরি কাহিনী ও কিংবদন্তী ভারতের বিভিন্ন ধ্রুপদী নৃত্যকলাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, মোহিনী অট্টম, কথাকলি, ওড়িশী, মণিপুরী ও কত্থকের যে ধারায় ভক্তিরসের প্রাধান্য, সেখানেই এটা স্পষ্ট। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় সব ভারতীয় ভাষায় রচিত সঙ্গীত ও কবিতার মধ্য দিয়ে দুই মহাকাব্যে বর্ণিত পৌরাণিক চরিত্রগুলি অমরত্ব লাভ করেছে। একই সঙ্গে তা হিন্দু ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও ঐক্যসূত্র বজায় রেখেছে। সন্তকবিরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে সহজ সরল আকারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছিলেন এবং এইভাবে হিন্দুধর্ম জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ভারতের ঐক্যসাধনে এসব প্রচেষ্টারই অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভক্তিমার্গী বিভিন্ন ধারণার কবিদের অবদানকে অগ্রাহ্য করে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয় রূপকে বোঝার কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না। সন্ত-কবিদের রচনা থেকেই জনমানসে হিন্দু ধর্মের সারমর্ম ও ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। হিন্দিভাষী এলাকায় তুলসীদাসের রামচরিতমানস, সুরদাসের পদাবলী, কবীরের দোঁহা ও মীরার ভজন হিন্দুমননকে পুষ্ট করেছে, ধর্মীয় দিশা দিয়েছে। আরও অনেক সন্ত-কবি ছিলেন, যাঁদের অবদানও খর্ব করা যায় না। মনে রাখতে হবে, কবীর ছাড়া রহিম ও রসখান-এর মতো

মুসলমান কবিও কথ্য-হিন্দী ভাষায় হিন্দুধর্মের ভক্তিমূলক বিষয়ে কবিতা লিখে গিয়েছেন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও সন্ত-কবিদের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা তাঁদের রচনার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে শুধু সমৃদ্ধই করেননি একই সঙ্গে সনাতনী হিন্দুধর্মকে নতুন আলোকে ব্যাখ্যা করে সংস্কারের পথ খুলে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তুকারাম (মহারাষ্ট্র)-এর 'অভঙ্গ', বাসব (কন্নড়)-এর 'বচন', ত্যাগরাজ (তামিল)-এর 'কৃতী' ভারতীয় ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সন্ত জ্ঞানেশ্বর মারাঠি ভাষায় 'গীতা'র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে কীর্তন ও নামগানকে সমৃদ্ধ করেছেন। নরলি মেহতা গুজরাতি ভাষায় ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, ভক্তিবাদী দাস-কবিদের মধ্যে কনক ও পুরন্দর দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এদের কয়েকজন সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। কিন্তু দু'জনের নাম আলাদা করে উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এঁরা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। শঙ্করদেবের কথা আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। অসম-এর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনে তাঁর অবদান বিরাট। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিমানসে বরাবরই সমগ্র ভারতবর্ষের অস্তিত্ব উজ্জ্বল ছিল। শঙ্করদেব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করে কৃষ্ণ-ভক্তির পীঠস্থানগুলি ঘুরে দেখেছিলেন এবং অন্যান্য কবি, দার্শনিক ও সন্তদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের রচনাতেও তার ছাপ পড়েছিল। গুরু নানক দেবও (1469-1539) দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিও সন্তদের রচনা ও অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তারপরে তিনি বিভিন্ন মতবাদকে মেলানোর প্রচেষ্টায় যে অপূর্ব রচনা (গ্রন্থসাহেব) করেন, তাতে নিজের লেখার সঙ্গে অন্য সন্ত-কবিদের রচনাও অন্তর্ভুক্ত করেন। কীর্তন ও সমবেত নামগান ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয়। বাংলাদেশ, অসম ও মহারাষ্ট্রে এ ধরণের ভক্তিগীতির বেশি প্রচলন দেখা যায়। কাওয়ালি গানও আর এক ধরণের ভক্তিগীতি, যা ইসলাম ধর্ম অনুপ্রাণিত। তবে ইসলাম ধর্মের বাইরের অন্য সন্ত-কবি বা সুফী সাধকদের রচনাও কাওয়ালি গানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে ভক্ত-কবিদের রচনায় ও ভক্তিগীতির মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভারতীয় মানস ও চিন্তাধারা গঠনের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় ভারতেরই সমান অবদান রয়েছে। হিন্দুধর্মের বেশির ভাগ শাস্ত্রগ্রন্থই রচিত উত্তর ভারতে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের দার্শনিকরা পরিমার্জন ও সংস্কারের সাহায্যে তাকে পরিশীলিত দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তির কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে বেদান্তের তিনটি প্রধান ধারার উপর। এই তিন ধারার মুখ্য প্রবক্তারা সবাই দাক্ষিণাত্যের মানুষ। অদ্বৈত বেদান্তের (একেশ্বরবাদ) প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য (788 খ্রীষ্টাব্দ) কেরলের মানুষ। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা রামানুজ (1017 খ্রীষ্টাব্দ) তামিলনাড়ুর এবং দ্বৈতবাদের প্রবক্তা মাধব (1238 খ্রীষ্টাব্দ) কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন।

হিন্দু সমাজ অনেক আগেই ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, যদি না সমাজের মধ্যেই যাবতীয় বিরুদ্ধমত, প্রতিবাদ ও সংস্কার প্রচেষ্টাকে জায়গা করে দেওয়ার রীতি থাকত। এই প্রতিবাদী বিরুদ্ধমত ও সংস্কারই হিন্দুসমাজের 'সেফটি ভালভ'-এর কাজ করে চলেছে। সমাজকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সইয়ে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সাহায্য করেছে।

দেশের চার প্রান্তে হিন্দুদের চার মহাতীর্থ অবস্থিত। উত্তরে বদ্রীনাথ (উত্তর প্রদেশে), পূর্বে পুরী (ওড়িশা), পশ্চিমে দ্বারকা (গুজরাত) এবং দক্ষিণে রামেশ্বরম (তামিলনাড়ু)। অসমের কামাখ্যাপীঠ শক্তিসাধনার সবচেয়ে বড় পীঠস্থান। আরও অসংখ্য তীর্থ বা পীঠস্থান রয়েছে যার পূর্ণ তালিকা তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। এরই মধ্যে উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার, প্রয়াগ ও বারাণসী, বিহারের গয়া, জম্মু ও কাশ্মীরের অমরনাথ ও বৈষ্ণোদেবী, রাজস্থানের পুষ্কর, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী ও ওঙ্কারেশ্বর, মহারাষ্ট্রের নাসিক ও পান্ধারপুর, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, তামিলনাড়ুর মন্দির-শহর মাদুরাই, তাঞ্জোভর ও কন্যাকুমারী, এবং কেরলের গরুভায়ুর দেশের সব জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীদের আকৃষ্ট করে।

গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী সহ দেশের অনেক নদনদীকেই পবিত্র গণ্য করা হয়। এই সব নদীর তীরে বহু ছোট-বড় তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধ স্তূপ ও সৌধের বেশ কিছু নিদর্শন দেখা যায়। বিহারের রাজগির ও বৌদ্ধগয়া, উত্তরপ্রদেশের সারনাথ, মধ্যপ্রদেশের সাঁচি বিদিশা তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি দক্ষিণ ভারতেও অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। বৌদ্ধমঠ ও বিহার ছড়িয়ে রয়েছে লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের উত্তরখণ্ড অঞ্চলে, এমনকি অরুণাচল প্রদেশেও। তেমনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার জৈনমন্দির। রাজস্থানের মাউন্ট আবু-তে জৈনদের বহু সৌধ আছে, যা অতুলনীয় সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। কর্ণাটকের শ্রবণবেলাগোলায় গোমতেশ্বরের মূর্তি তার বিশাল আকৃতি ও স্থাপত্যশৈলীর জন্য সহজেই সম্ভ্রম ও ভক্তির উদ্রেক করে।

দেশের বিভিন্ন গুহা-চিত্রে ভারতীয় শিল্পকলা ঐতিহ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন ধরা রয়েছে। তারমধ্যে মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের অজন্তা, ইলোরা, কর্ণাটকের বাদামি এবং মহারাষ্ট্রেরই এলিফ্যান্টা গুহাচিত্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সব গুহায় চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং পাথর কুঁদে তৈরি স্থাপত্যশৈলীর যে বিচিত্র রত্নসম্ভার রয়েছে, তার জন্য যে কোনও দেশই গর্ববোধ করতে পারবে।

ইসলামী মসজিদ, স্মারক ও স্মৃতিসৌধ দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। স্থাপত্যশৈলীর উৎকর্ষের বিচারে এর অনেকগুলিই প্রথম শ্রেণীর কীর্তি। অপূর্ব সুন্দর তাজমহলও ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যেরই অঙ্গ। অনেক স্থাপত্য কর্মই হিন্দু ও মুসলমান শৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি। স্থাপত্যরীতির বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে সেখানে

অনেক সাহসী পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। এদেশে অনেক বিরাট মাপের গির্জাও নির্মিত হয়েছে। শিখ ধর্মের উপাসনা মন্দির বা গুরুদ্বার কিছুটা ভিন্ন স্থাপত্যশৈলীর জন্য বিশিষ্ট। সাধারণ ভাবে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণে তৈরি হলেও গুরুদ্বার গঠনপ্রকরণে নিজস্ব মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির তার উজ্জ্বল উদাহরণ, তবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন গুরুদ্বার রয়েছে। মনে রাখা দরকার, শিখ গুরুদ্বারের দরজা সব ধর্মের মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। অন্য ধর্মের বহু ভক্তই সেখানে নিয়মিত যায়।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হল আর একটি ক্ষেত্র যেখানে দেশের সাংস্কৃতিক অভিন্নতার প্রতিফলন ঘটেছে। মনে করা হয়, সাম বেদ থেকেই ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল এবং বস্তুত সেজন্যই একে 'বেদাঙ্গ' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জনশ্রুতির দাবি, অতি প্রাচীন কালে গন্ধর্বদের হাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্ম ও লালনপালন হয়েছিল। গন্ধর্বরা সঙ্গীতকলা চর্চায় মনোনিবেশ করে দীর্ঘ সাধনায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে দিব্য আনন্দের স্তরে উন্নীত করেছিল। জনশ্রুতির কথা বাদ দিলেও, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত দেশীয় লোকসঙ্গীত থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করেছে। যেমন, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভূপালি, আহির ভৈরব, সারং প্রভৃতি রাগ প্রশ্নাতীতভাবে লোকসঙ্গীত থেকে এসেছে। পরে যদিও সঙ্গীতজ্ঞদের হাতে রাগগুলির অনেক সংস্কার-পরিমার্জন হয়েছে। চৈতি, হোরি, কাজরি, রসিয়া, ঠুংরি প্রভৃতি লঘু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও লোকসঙ্গীতের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির হুবহু প্রতিফলন হয়েছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিকাশের ঐতিহ্যে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় ধর্মের শিল্পীদের 'ঘরানা'ই এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তাদের বৈচিত্র্যময় শৈলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীতের এই জগতে ধর্মীয় বিশ্বাস কোনও প্রাচীর তুলতে পারেনি। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের শাসকরাই সঙ্গীত কলার পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের মধ্যেও অনেক মিল দেখা যায়। কয়েকটি রাগরাগিণী দুই ধারার সঙ্গীতেই রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা, বা কর্ণাটকী সঙ্গীতের জনক বিদ্যারণ্য। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন প্রসঙ্গেও এঁর নাম উল্লেখ করা হয়। হুক্কা ও বুক্কা, দুই ভাইকে বিদ্যারণ্যই বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রায় 250 বছর ওই সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল। এবং সেই সময়ে কর্ণাটকী সঙ্গীত পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পরে কর্ণাটকী সঙ্গীতের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে তামিলনাড়ু ও কেরল। অনেক পরে হায়দার আলি, টিপু সুলতান এবং তাঁদের পরে কর্ণাটকের ওয়াদিয়ার রাজবংশ নতুন করে এই সঙ্গীতধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে উল্লেখ করা ভাল যে দাক্ষিণাত্য একই সঙ্গে উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেশ কয়েকজন নামী শিল্পীর জন্ম দিয়েছে, যেমন, মল্লিকার্জুন মনসুর, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, বাসবরাজ রাজগুরু প্রমুখ। এভাবেই

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রাজ্য ও আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করেছে।

একই পথে ঐক্যের সূত্রে অতীত ও বর্তমান বাঁধা পড়েছে। গাঁথা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক-জাতিগত-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে। তাই সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত এলাকাতেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, সুদূর অরুণাচল প্রদেশেও ভারতীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই ওই এলাকাকেও পবিত্র ভারতভূমির অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদ একটা হ্রদ তৈরি করেছে, নাম পরশুরাম কুণ্ড। মকরসংক্রান্তির দিন ওই কুণ্ডে স্নান করলে সব পাপ-তাপ ধুয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এছাড়া অরুণাচলের মালিনিথান শহর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রানাইট স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। ঐরাবতের পিঠে ইন্দ্র, রথারূঢ় সূর্য এবং শিবের বাহন ষাঁড় নন্দীর মূর্তি ওই সব স্থাপত্যের অন্যতম বিষয়। আরও একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কথিত আছে, পুরাকালে ভীষ্মক নামে এক রাজা সেখানে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। সেখানে একটি জমকালো দুর্গ ও শহরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তাওয়াঙ শহরে আছে সুপ্রাচীন ও বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার। দশ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই বৌদ্ধবিহারে এখনও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বহু সম্পদ রক্ষিত আছে।

এবার সনাতন হিন্দু সমাজের কাঠামোর দিকে নজর ফেরানো যাক। এই সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি গোটা দেশেই মোটামুটি একইরকম। বস্তুত, এ দেশের যে সব সম্প্রদায় বাইরে থেকে আসা ধর্মগ্রহণ করেছে, তাদের সমাজের মধ্যেও হিন্দু সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দেখা যায়।

হিন্দু সমাজের কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়—

প্রথমত, সনাতন হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করত, সামাজিক অবস্থান পূর্বনির্ধারিত। সোজা কথায় এর অর্থ, কে কোন জাত-কুলে জন্মেছে, তাই তার সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে দেবে। কর্মসূত্রে দক্ষতা অর্জন করলেও তা সামাজিক অবস্থানে তারতম্য ঘটাবে না। চেষ্টা করে সামাজিক অবস্থান উন্নত করার নজির ছিল না তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রমী ঘটনা। সমাজের উপরতলায় ওঠার পথ ছিল কঠিন ও গতি খুবই শ্লথ। এখনও হিন্দুসমাজে এর রেশ রয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুসমাজ পদমর্যাদা অনুসারে স্তরবিন্যস্ত ছিল। সামাজিক কাঠামোর মূল স্তরগুলি উপর থেকে নিচে চতুর্বর্ণের উপরে দাঁড়িয়ে। এ ছাড়া বর্ণকাঠামোর বাইরে ছিল আর এক ধাপ। প্রতিটি বর্ণের মধ্যে আবার একাধিক জাতিবর্ণের স্তরভেদ ছিল, এখনও আছে। এছাড়া বহু জাতি পরে এই কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেরিতে যুক্ত হওয়া জাতগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও মূল চার বর্ণ স্তরের মধ্যেই তারা জায়গা করে নিয়েছে।

তৃতীয়ত, এই সামাজিক অবস্থানের মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসাবে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের

উপরেই জোর দেওয়া হত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে মেলামেশা, একত্র আহার ইত্যাদি শুধু সম শ্রেণীর বা জাতের মধ্যেই চলত। নিচু জাতের মানুষের সঙ্গে নয়। ছোঁওয়াছুঁয়ি ও নিচু জাতের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করলে জাত যেত। সেজন্য ছোঁওয়াছুঁয়ি বাঁচাতে বিস্তারিত নিয়মবিধি মেনে চলতে হত।

চতুর্থত, পুরুষার্থ বা জীবনের লক্ষ্য। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম—ঈশ্বরভক্তি, ন্যায় নিষ্ঠা, সৎ পথে চলা এবং ব্যক্তি ও নিজের জাতের প্রতি কর্তব্য করা। অর্থ—ধন উপার্জন। কাম—কায়িক কামনাবাসনা। এবং মোক্ষ—অর্থাৎ মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা।

পঞ্চমত, জীবনের এই চার লক্ষ্যের সাধনে চার আশ্রম বা চার পর্বের জীবন যাপনের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য—কৌমার্য পালন ও বিদ্যাচর্চার সময়।

গার্হস্থ্য—ধন উপার্জন, সংসার ধর্ম পালন, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি।

বাণপ্রস্থ—সংসার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ।

সন্ন্যাস—সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন। তবে শেষ আশ্রমটি শুধু মাত্র দ্বিজ বা বর্ণ শ্রেষ্ঠের জন্য নির্দিষ্ট।

ষষ্ঠত, হিন্দুসমাজে ঋণদায় সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা আছে। প্রতিটি ব্যক্তিই ঈশ্বর, সাধসন্ত, পূর্বপুরুষ ও সমাজের কাছে ঋণী। এই ঋণশোধের চেষ্টাও ধর্মপালনের একটা অঙ্গ।

সর্বশেষে, হিন্দুধর্মের মূল কথাটি বিধৃত রয়েছে কর্মফলের মধ্যে। কর্মফল বলতে কী বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এর অর্থ—পূর্ব জন্মের কৃত কর্মের ফল এ জন্মে ভোগ করতে হয়। এজন্মের কর্মের ফল পরজন্মে ফলবে। কর্মফলের চিন্তার মধ্যেই গেঁথে আছে জন্মান্তরবাদের চিন্তা।

এসবই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক কাঠামোর প্রধান দার্শনিক ভিত্তি। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি যতটা সনাতনী ঐতিহ্য ও শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত, ততটা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে নয়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ধ্যানধারণাও অনেকটা পাল্টাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের আবেগের কাছে এখনও এই সব ধারণার প্রবল আবেদন রয়েছে। অনেক হিন্দুই বিশ্বাস করতে চান যে বর্ণাশ্রম ও বর্ণকাঠামো এখনও বহাল। এই বর্ণকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর তুললেও বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্ম নিজেদের সমাজের আচার আচরণে তা একেবারে মুছে ফেলতে পারে নি। এমনকি যারা ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারাও মনের গভীর থেকে হিন্দুধর্মের বীজ পুরোপুরি উপড়ে ফেলতে পারে নি। নিছক ধর্মান্তকরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনের গভীরে প্রোথিত বিশ্বাসকে সমূলে তুলে

ফেলা সম্ভবও নয়। গোড়ায় তাই, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজে নবদীক্ষিতদের আগের সামাজিক কাঠামোই বজায় রাখতে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, এদেশে সদ্য ধর্মান্তরিতদের বেঁচে থাকার জন্যই পুরনো জীবিকা আঁকড়ে থাকার ও ন্যূনতম সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়েছিল। সে জন্য তারা তাদের ছেড়ে আসা হিন্দু সমাজের জাত-পেশা আঁকড়ে থাকার পাশাপাশি হিন্দু প্রতিবেশীদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দু সমাজে যজমানি প্রথার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ জাত-পেশার সুবাদে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য বা সহায়তা নেওয়ার ব্যবস্থায় পারস্পরিক নির্ভর সম্পর্ক আগেই বহাল ছিল। গ্রাম সমাজ প্রয়োজনে এব্যাপারে সমন্বয়ের কাজ করত। মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন এলাকায় শিকড় গাড়ায় সঙ্গেই আঞ্চলিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিও গ্রহণ করতে লাগল। অন্যদিকে, ব্যাপকহারে না হলেও হিন্দুসমাজও অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করল। এভাবেই শিল্পকলা, স্থাপত্য, পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস সাহিত্য, সঙ্গীত-নৃত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন শৈলীর মিশ্রণে নতুন ধারার জন্ম হতে শুরু করল, যা এই ভিন্ন ধর্ম, ও সংস্কৃতির যুক্ত প্রয়াসের ফল।

শ্বেতাঙ্গদের পদানত হওয়ার বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিরোধ জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের জন্য নতুন শক্তি জুগিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শ্বেতাঙ্গদের আগ্রাসনে বিপদগ্রস্ত হওয়ায় প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। অনেক সময়ই তারা একযোগে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিরোধে নেমেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিকে কাছাকাছি এনে দেয়। যদিও শেষদিকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গভীর বিবাদ ও অবিশ্বাস মাথাচাড়া দেয়, যার পরিণতি হয় দেশভাগে। আধুনিক শিক্ষা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পায়ন ও নগরায়ন দেশের সংহতির নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

কিছু সমস্যা রয়েই গিয়েছে। গত কয় দশকে নতুন কিছু সমস্যাও জন্ম নিয়েছে। জাতিসত্তার আন্দোলন, ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাতের সম্পর্কে নতুন মোড়, ভাষাগত সংঘাত, আঞ্চলিকতাবাদ ও তারই জেরে আরও ছোট ছোট এলাকায় স্বশাসনের দাবিতে আন্দোলন—এসবই সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে।

তিন

বর্ণ ও জাতি

ভারতীয় সমাজ কাঠামোর প্রধান প্রধান বিভাজন ও উপবিভাজনের চেহারা যেমন জটিল, তেমনই বিভ্রান্তিকর। এই জটিল কাঠামোর চিত্রকে একটা সীমার বাইরে সরল করে দেখানোর চেষ্টা করলে সামাজিক বাস্তবতার চিত্রটাই বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শাস্ত্র ও প্রাচীন সামাজিক বিধিনিষেধই এই সমাজ কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্র সাধারণত 'কী হয়েছে'র বদলে 'কী হওয়া উচিত' সেই দিকেই বেশি করে ইঙ্গিত করেছে। বাস্তবে যা হয়েছে, তা 'হওয়া উচিত' থেকে অনেকটাই আলাদা। তবে, সব আমলেই সমাজের এই সব অনুশাসন ও বিধিনিষেধ এড়িয়ে চলার অনেক উপায় ছিল। ভারত বিষয়ে অনেক লেখকই এনিয়ে অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। যেমন, 'চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা' বলাটাই বিরাট ভুল। কারণ, এমন অনেক 'জাতি' বা জাত ছিল, যাদের শ্রেণী বিন্যাস ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। কোনও অঞ্চল বিশেষের উপর নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণা নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক কাঠামোর গঠন প্রকরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারলেও গোটা দেশের জন্য সেই তথ্য যথেষ্ট নয়। কারণ, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি ভিন্ন। এছাড়া যেহেতু বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের অতীত পরিচয়কে নতুন করে ঢেলে সাজানোর অবিরাম প্রয়াস চালিয়েছে, তাই তাদের সামাজিক অবস্থানেও ক্রমাগত পরিবর্তন এসেছে। তবে, এটা লক্ষ্যণীয়, নিজেদের অবস্থানের পরিবর্তনে আগ্রহী ওই সব গোষ্ঠী সমাজে তাদের অবস্থানকে প্রায়শই উন্নত করে তোলার চেষ্টা করলেও, সামাজিক স্বীকৃতি বা অনুমোদন পেতে অনেক সময় লেগে যেত।

ভারতীয়মাত্রই আত্মপরিচয়ের একাধিক চিহ্ন বা লক্ষণ বহন করে। পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে, কখন, কী ভাবে কোন পরিচয় তুলে ধরা হবে। ধর্ম, নিবাস ও পারিবারিক পদবি পরিস্থিতি বিশেষে পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট হলেও অনেক ক্ষেত্রেই জাতি, গোত্র, কুল-এর উল্লেখ করতে হয়। ইংরাজিতে জাতি অর্থে caste শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'কাস্ট' শব্দটি অনেক ব্যাপক ও বিভ্রান্তিকর অর্থেই ব্যবহৃত, কখনও একটি গোটা বর্ণ অর্থে, কখনও বা বর্ণসমাজে নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে এবং স্ব-বর্ণে বিবাহ করে এমন গোষ্ঠীকে বোঝান হয়। এছাড়া কোনও কোনও

বড় গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসা ছোট গোষ্ঠীকেও একই অভিধা দিতে দেখা যায়। এই বইয়ে 'জাতি' কথাটি উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে, গোত্র হল জাতিরই অন্তর্গত বিভাজন, যেখানে নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ সম্পর্ক করা হয়। স্বজাতের মধ্যে বিবাহ করা যায়, কিন্তু একই গোত্রের মধ্যে নয়। একই গোত্রভুক্ত মানে, সুদূর অতীতে ওই গোত্রের সব সদস্যের পূর্বপুরুষই ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। বংশের প্রথম পুরুষ সাধারণত কোনও পৌরাণিক বা কাল্পনিক চরিত্র, অথবা কোনও মুনি-ঋষি হন। তবে সমাজের নিচুতলার মানুষেরা অনেকেই তাদের ছেড়ে আসা আদিবাসী-টোটেম বিশ্বাসের জের টেনে জন্তু জানোয়ার বা গাছ-পাহাড় প্রভৃতি নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গে আদি-সম্পর্কের সংস্কার বজায় রেখেছে। কুল বা বংশ সাধারণত পাঁচ-ছয় পুরুষের ধারাকে সূচিত করে, তার আগের ধারা অনেক সময়ই খুব স্পষ্ট নয়। অনেক জাতি, এমনকি কিছু উপজাতির নিজস্ব পেশাদার চারণ বা ভাট আছে, যাদের কাজই হল বংশাবলীকে আরও প্রাচীনত্বের দাবিদার করে তোলা। প্রাচীনত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সঙ্গেই এই চারণরা ওই সব বংশের উৎপত্তির মূলে কোনও না কোনও কল্পিত পৌরাণিক চরিত্রকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। মনে রাখা দরকার, এ সব বংশাবলীর অনেকটাই মনগড়া, একই ভাবে মনগড়া পূর্বপুরুষদের বীরত্ব ও মহান কীর্তিগাথা।

প্রথমে বর্ণ সম্পর্কে ও পরে জাতি বিষয়ে খতিয়ে দেখা যাক।

বর্ণ

হিন্দু সমাজে বিভিন্ন জাতের অবস্থান নির্দেশক মাপকাঠিই বর্ণ। সামাজিক পদমর্যাদার সিঁড়িতে কোন জাতি বা জাতের অবস্থান কোথায়, বর্ণ সেটাই চিহ্নিত করে থাকে। একই সঙ্গে সমাজের শ্রেণীবিভাজন বা বিন্যাসও বর্ণের মাধ্যমেই সূচিত হয়। এক একটি বর্ণের স্তরে মোটামুটি সমমর্যাদাসম্পন্ন একাধিক জাতের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের তিন উচ্চ বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই তিন বর্ণই দ্বিজ, অর্থাৎ জন্মের পরে উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কারের মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয় জন্ম হয়ে থাকে। চতুর্থ বর্ণ—শূদ্র। শূদ্র বলতে কুমোর, তাঁতি, কামার প্রভৃতি নির্দিষ্ট কারিগরি বা হস্তশিল্প পেশায় যুক্ত জাত-কে বোঝায়। এই সব পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য নয়। চতুঃবর্ণ কাঠামোর এখানেই শেষ। কিন্তু এর বাইরে একটি পঞ্চম শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এই শ্রেণীতে সেই সব জাতের জায়গা হয়েছে, তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' পেশায় নিযুক্ত থাকার কারণে সমাজ যাদের অস্পৃশ্য করে দিয়েছে। যেমন, মেথর, মুচি ইত্যাদি। তাদের বলা হয় 'অন্ত্যজ', অর্থাৎ বর্ণকাঠামোর বাইরে যাদের অবস্থান। আইন করে অস্পৃশ্যতা বন্ধ করা হলেও বাস্তবজীবনে

দেশের প্রায় সব জায়গাতেই গোপনে বা প্রকাশ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার এখনও চলছে। গান্ধীজি যাদের 'হরিজন' বলেছিলেন, সেই অন্ত্যজরা এখন নিজেদের 'দলিত' হিসাবে সংগঠিত করতে শুরু করেছে। ভারতীয় জনসংখ্যার মোটামুটি 16 শতাংশই এই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। তফসিল উপজাতি—অর্থাৎ আদিবাসী, আদিম জনজাতি ও গিরিজনরা মোট জনসংখ্যার 7 শতাংশ। এদের অনেকেই এখন অস্পৃশ্যতার 'দায়' থেকে মুক্ত। তবু তাদেরও 'অন্ত্যজ'দের মধ্যে ধরা হয়। সব মিলিয়ে, হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বিরাট সংখ্যক জাতকে মোট পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

সমাজ কাঠামোর এই শ্রেণীবিন্যাস যথেষ্ট ঋজু ও আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে তা অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। এটা এমন একটা আদর্শ মডেল-এর কল্পনা, যেখানে মেধা ও বৃত্তির গুরুত্ব এবং তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অনুযায়ী সমাজকে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সমাজব্যবস্থার জটিল বাস্তবচিত্রের প্রতিফলন তাতে ধরা পড়েনি। হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অস্পৃশ্য জাতিদের চতুঃবর্ণের মধ্যে জায়গা হয়নি। আরও জটিলতা রয়েছে। উত্তর ও পূর্ব ভারতের কায়স্থদের অবস্থান সমাজের কোন শ্রেণীতে হবে? কেরলের নায়ার সম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয়, নাকি শূদ্র, কোন শ্রেণীতে ফেলা হবে? বাস্তবে, গোটা ভারতে কোনও অভিন্ন বর্ণ কাঠামো নেই। একই জাতিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানে থাকতে দেখা যায়। এমনকি বর্ণব্যবস্থাও গোটা দেশে এক ধাঁচের নয়। যেমন দাক্ষিণাত্যেই উদ্ভব হয়েছিল, এমন কোনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতি সেখানে নেই। বর্ণকাঠামোর মডেলে জাতিগুলির পদমর্যাদা অনুসারে সামাজিক অবস্থান যতটা সরল বলে মনে হয়, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল কমই। কোনও কোনও জাতের সামাজিক অবস্থান নিয়েও মতভেদ আছে। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিচার-বিতর্ক হয়েছে, বিচার হয়েছে রাজসভাতেও। অধুনা বিচার হচ্ছে আদালতে। এধরনের বিচারের মীমাংসা অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে, ফলে বিবাদ থেকে শুরু হয়েছে সঙ্ঘর্ষ। আবার এমন উদাহরণও আছে, যেখানে একটা গোটা জাতি তার বর্ণ-নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আচার-ধর্ম পালন না করায়, তাকে সমাজের নিচের তলায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ণপ্রথার এই অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য বহুবার তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর চেষ্টা হয়েছে। কিছু কিছু সমর্থন এসেছে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ থেকেও। বর্ণব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভক্তিমার্গের বিভিন্ন সন্ত-কবি। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় নিহিত অসাম্য, বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে জোরাল আন্দোলনও হয়েছে।

সমাজের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে বর্ণের ভূমিকা বা উপযোগিতা কমই। বর্ণ শুধু মোটামুটিভাবে প্রতিটি জাতের সামাজিক অবস্থান, সমাজজীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য আচার আচরণ, এবং প্রত্যাশিত সামাজিক ভূমিকাটুকু নির্দিষ্ট করে

দেয়। বিগত কয় দশক ধরে বর্ণ-স্বার্থ ও বর্ণ-আনুগত্যের ভিত্তিতে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে, বর্ণের চাইতে সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে জাত বা জাতিই অনেক সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেই সঙ্গে পরিবার, বংশধারা ও আত্মীয়-পরিজনের ভূমিকাও অনেকখানি।

'জাতি' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে 'জাতি' (caste)-র উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাখ্যাগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার। কারণ, এই ব্যাখ্যার সঙ্গে 'বর্ণ'-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং 'জাতি'র উৎপত্তির বদলে আসলে বর্ণের উৎপত্তির ব্যাখ্যাই এই সব তত্ত্বে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরসৃষ্ট বা দৈবসম্ভূত জাতির তত্ত্বটিই সবচেয়ে পরিচিত ও বহুশ্রুত মতবাদ। ঋগ্‌বেদের পুরুষসুক্ত থেকেই এই তত্ত্বের সূত্রপাত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পুরুষ বা সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ আদি সত্ত্বার আত্মদানের মধ্য দিয়েই সমাজের চর্তুবর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল। এটা বিশ্বাস করা হয় যে একটি উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্যই সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তার মাথা বা মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং জানু থেকে বৈশ্যের জন্ম হয়েছিল। আর শূদ্রের জন্ম হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার চরণ থেকে। জন্মের এই উৎস সন্ধানকে চতুর্বর্ণের সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকার বড়জোর একটা প্রতীকি বর্ণনা বলা যায়। মস্তক, বাহু, জানু ও চরণ—মানবশরীরের এই চার অঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতীক অনুযায়ী চতুর্বর্ণের আপেক্ষিক সামাজিক অবস্থানকেই চিহ্নিত করছে। সনাতনী সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বেলাতেও এই বিন্যাস বজায় থাকছে। জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদান, সেই সঙ্গে যজ্ঞ ও বলির অধিকার ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষে জায়গা করে দিয়েছে। এর পরেই ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যপ্রশাসন ইত্যাদির দায়িত্ব যার। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বৈশ্য, যার হাতে বাণিজ্য ও কৃষির পরিচালন ভার। সমাজে এই তিন বর্ণের নিচে জায়গা পেয়েছে শূদ্র—যাদের কাজই হল শ্রম ও বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে অন্য তিন বর্ণের সামাজিক চাহিদা পূরণ করা।

বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে ত্রিগুণ তত্ত্বের কথা কিছুটা কম শোনা যায়। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তায় মানুষের অন্তর্নিহিত তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই তিন গুণ শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, মনুষ্যেতর প্রাণী, প্রাণহীন বস্তু এবং মানবিক বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যেও থাকতে পারে বলে ধরা হয়। সত্ত্ব গুণের মধ্যে মহৎ চিন্তা ও কাজ, সত্য ও জ্ঞান, এবং যাবতীয় ভাল ভাল প্রবণতার সমাহার। রজঃ গুণের বিশেষত্ব হল ভোগবিলাস, আমোদপ্রমোদ, তীব্র আবেগ, অহঙ্কার ও বীরত্ব জাহির করার প্রবণতা। ত্রিগুণের মধ্যে সবচেয়ে নিচে রয়েছে তমোগুণ। যাবতীয় স্থূলতা, রুচিহীনতা, বুদ্ধিহীন কায়িক শ্রম করার প্রবণতা তমোগুণের অধিকারীদের মধ্যে দেখা যায়। সাত্ত্বিক গুণের অধিকারীকে ব্রাহ্মণ, রজোগুণের অধিকারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং তমোগুণের অধিকারীকে

শূদ্র—এই শ্রেণীবিন্যাসে চিহ্নিত করা হয়। মুশকিল হল, চতুর্বর্ণের মধ্যে এই ত্রিগুণ খোঁজা যেতেই পারে। কিন্তু গোটা জনসমষ্টিকে এধরনের শ্রেণীবিন্যাসে কী করে ভাগ করা সম্ভব, তা বোঝা কঠিন।

বর্ণসংক্রান্ত তৃতীয় তত্ত্বে জাতিসত্তাগুলির মিশ্রণ, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের মানুষের জন্য সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করার প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার কোনও একটিই এককভাবে বর্ণের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। হিন্দু সমাজ বিবর্তনের আদি পর্বে, অর্থাৎ বৈদিক যুগে জাতি এবং বর্ণ (শরীরের বর্ণ বা গায়ের রঙ) গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমাজের পূর্ণ বিকশিত আকারে এই বর্ণ নিতান্তই মনগড়া মাপকাঠিতে পরিণত হয়। তখন আর তা জৈবিক বাস্তব রইল না। আর্যকরণ (Aryanization) অবশ্যই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফল। কিন্তু এই যোগাযোগ মোটেই একতরফা দাতা-গ্রহীতার প্রক্রিয়া ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অনার্য আচার-সংস্কার, যা ব্রাত্য বলে বর্জিত ছিল, পরে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আর্যসমাজের আচার-বিশ্বাস, জীবনদর্শন ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রক্রিয়ার উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। আর্যসমাজের প্রসারণশীল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব আচার বিশ্বাস সমেত জায়গা করে দেওয়া শুরু হয়েছিল। তারা আর্যসমাজে এসে কিছু কিছু নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণ করে ঠিকই, সেইসঙ্গে কিছু পুরনো আচার-বিশ্বাস, সংস্কারও আঁকড়ে ধরে রাখে। সব মিলিয়ে ওই সব নতুন জায়গা পাওয়া জনগোষ্ঠীগুলিই বৃহত্তর হিন্দুসমাজে তাদের প্রভাব ফেলতে শুরু করে। আর্যসমাজের পূর্ণ বিকাশের আগে থেকেই এদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পেশা-কেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। উপযুক্ত মর্যাদা ও আচারবিধি নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদেরও সমাজে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল।

জাতি

জাতি অর্থে caste **শব্দটি** খুবই বিভ্রান্তিকর। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন অর্থ বোঝাতে এই শব্দটি নানা সময় ব্যবহার করা হয়। যে গোষ্ঠীর মানুষজন নিজেদের মধ্যেই বিবাহসম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখে, অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ করে, সমাজে যাদের জন্য আচারবিধিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে ঐতিহ্য মেনে নিজেদের গোষ্ঠীর পেশায় যুক্ত থাকে, তাদের একটি 'জাতি' বা জাত হিসাবেই অভিহিত করা উচিত। তবে এব্যাপারে দুটি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত, তিন উচ্চবর্ণকে তাদের জাতিবাচক নামেই অভিহিত করা যেতে পারে। যদিও জাতি আসলে বর্ণের

উপবিভাগ মাত্র। দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু জাতি-গুচ্ছের একটিই নাম থাকে, শুধু নামের আগে-পিছে অতিরিক্ত পরিচয় যোগ করে ওই জাতি-গুচ্ছের অন্তর্গত নির্দিষ্ট জাতিটিকে সনাক্ত করা হয়। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা স্ববর্ণে বিবাহ করে, এমন বেশ কয়েকটি জাতি-তে বিভক্ত। যেমন, কান্যকুব্জ, সরযুপাড়িন, গৌড় ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রে তারা দেশস্থ, কোকনস্থ, কারখাড়ে ও সারস্বত গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণদের প্রধান গোষ্ঠীগুলির নাম আয়েঙ্গার ও আয়ার। এই জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও আবার একাধিক ছোট ছোট উপগোষ্ঠী তাদের তাদের আলাদা আলাদা পরিচয় সহ থাকতে পারে। এধরনের উপগোষ্ঠীও আবার নানা ধরনের হয়। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের যেমন 'বিশওয়াস' নামে আলাদা একটা পরিচয় দেওয়া হয়। বিশ, অর্থাৎ কুড়ি সংখ্যা থেকে এই বিশেষণটি এসেছে। এক থেকে বিশ পর্যন্ত গুণের মাপকাঠিতে যে যত গুণের অধিকারী, কান্যকুব্জ সমাজে তার পদমর্যাদা ও অবস্থান তত উঁচুতে। সমাজের যে উপগোষ্ঠী বিশটি গুণের অধিকারী, স্বভাবতই তারা সমাজের শীর্ষস্থানে জায়গা পায়। অন্যরা 'বিশওয়াস'-এর মাপকাঠিতে নিজেদের অবস্থানের নিরিখে তুল্যমূল্য সামাজিক মর্যাদা পায়। বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে ওই গোষ্ঠীর কিছু মানুষ দেখা যায়, যাদের মধ্যে 'বিশওয়াস'-এর আঠারো বা বিশ নম্বর নিয়ে পুরনো গর্বের রেশ ভালভাবেই রয়েছে। সরযুপাড়িন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন উপগোষ্ঠী আচার-বিচারে কতটা শুদ্ধতা বজায় রেখে চলে, সেই হিসাবে ভাগাভাগি রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদা বেশি 'পংক্তিপবন' গোষ্ঠীর। সামাজিক অনুষ্ঠানে এই গোষ্ঠীর মানুষ অন্য ব্রাহ্মণদের থেকেও আলাদা আসনে বসে ভোজন করে। সরযুপাড়িন গোষ্ঠীভুক্ত অপেক্ষাকৃত কম 'শুদ্ধ' জাতের মানুষদের তাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে বসার অধিকার নেই। এখনকার তরুণ প্রজন্ম এইসব আচারের কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু একাংশের মনে এখনও এই রীতির মধুর স্মৃতি ভালভাবেই রয়েছে। এইসব গোষ্ঠীর অন্তর্বিভাগের আরও একটি বিশেষত্ব, যাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি, তারা ইচ্ছা করলে নিচের তলার মেয়েদের বিয়ে করতে পারে। নিজেদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ঘরের মেয়ে পাওয়া না গেলে তখন তারা এটা করে থাকে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তারা নিজেদের পরিবারের মেয়ের বিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচুস্তরের পরিবারে দেয় না। উচ্চবর্ণ ছাড়াও, অর্থাৎ যারা দ্বিজ নয়, সেরকম কিছু জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টির ক্ষেত্রেও জাতিবাচক পরিচয় ব্যবহার করতে দেখা যায়। সবর্ণ বা অন্তর্বিবাহ রীতি আছে, এমন একাধিক গোষ্ঠীর সমন্বয়েই এই জাতিসমষ্টিগুলি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পর্বতের 'বাদাগা'দের নিজস্ব জাতিবাচক নাম আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও একাধিক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যারা অন্তর্বিবাহ মেনে চলে। এই প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব নাম ও পরিচয় আছে। মহারাষ্ট্রের কুনবিস, গুজরাতের পাতিদার ও বারিয়া গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলে রাখাল ও জল-বহনকারীরা

রাউত নামে পরিচিত। কিন্তু তাদের মধ্যেও কনোজিয়া, মেরিয়া, কোসারিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি এবং সম্ভবত আরও অনেক উপগোষ্ঠী রয়েছে, এবং তারা প্রত্যেকেই অন্তর্বিবাহ রীতি মেনে চলে। নাপিত, ধোপা, স্বর্ণকার, কর্মকার ও কুম্ভকার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম একাধিক উপগোষ্ঠী দেখা যায়।

জাতি বিষয়ে এই সরলীকৃত ব্যাখ্যাও যথেষ্ট জটিল মনে হতেই পারে। কিন্তু এই জটিলতা এড়ানর উপায় নেই। কারণ, বাস্তব সমাজচিত্রটি আরও অনেক জটিল। ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও আচার সংস্কারের সমাবেশ ঘটায় তার মধ্যে একটি সার্বিক অথচ পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস কাঠামো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পেলেও সেই কাঠামোর সবধরণের সামাজিক উপাদান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে যুক্তিযুক্তভাবে মেলানো আরও কঠিন। এই অবস্থায়, বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য একটি ত্রি-স্তর কাঠামোর কল্পনা করা যেতে পারে। একেবারে উপরতলায় থাকবে স্বীকৃত চার বর্ণ এবং স্বীকৃতি না-পাওয়া আর একটি বর্ণ প্রতিটি বর্ণের ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে পাওয়া সামাজিক অবস্থান ও সমমর্যাদাসম্পন্নদের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই সামাজিক আচার-সংস্কারের অধিকার থাকছে। মাঝখানের স্তরে থাকছে জাতিগুচ্ছ, তাদের জাতিবাচক নাম-পরিচয় সহ। তবে এই জাতিগুচ্ছগুলি একাধিক জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত, যারা অন্তর্বিবাহ মেনে চলে। একেবারে নিচের তলায় থাকছে সবর্ণ বা অন্তর্বিবাহ মেনে চলা জাতিগোষ্ঠী। যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বিপরীতে শুধু শ্রেণী বিভাজনই চিহ্নিত করে না, বিভিন্ন গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীর সামাজিক আচারবিধিও নির্দিষ্ট করে দেয়। একই সঙ্গে গোষ্ঠীগুলির এই শ্রেণীবিভাজন সামাজিক কাঠামোর কার্যকরী একক হিসাবেও চিহ্নিত হয়।

এই আলোচনার পরে এখন 'জাতি'র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে—

(ক) অন্তর্বিবাহ মেনে চলে এমন জনগোষ্ঠীই জাতি।

(খ) জাতগুলি পদমর্যাদার দিক থেকে উচ্চ-নীচ নানা স্তরে বিন্যস্ত।

(গ) প্রতিটি জাতিরই জাত-পেশা নির্দিষ্ট রয়েছে।

(ঘ) কোন জাত কতটা 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ', তার উপরেই জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক আদান প্রদানের সম্ভাবনা নির্ভর করে।

(ঙ) যে কোনও জাতিরই প্রতিটি সদস্য মোটামুটিভাবে একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অংশীদার। অর্থাৎ, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ যে সব প্রচলিত চিন্তাধারা ও আচরণ অনুসরণ করে, এমন কি বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার সংস্কার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন—এসবেরই উত্তরাধিকার জাতি-সদস্যদের উপর বর্তায়। এই উত্তরাধিকার প্রতিটি জাতির এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে, জন্মসূত্রে নয়।

(চ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিগুলি নিজের নিজের গ্রামের অভ্যন্তরে এবং বহু গ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিক বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রেও তা কাজে লাগে।

জাতির এই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি মোটামুটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তবে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই কিছু অনুমোদিত ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এমনিতে জাতি মাত্রই সবর্ণ বা অন্তর্বিবাহের রীতি মানলেও নিচু তলার কিছু জাতের ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটতে দেখা যায়। তারা অন্য জাতের স্ত্রী-পুরুষকে বিবাহসূত্রে স্বজাতিভুক্ত করে নেয়। অন্য জাতের সদস্যের সঙ্গে বিবাহসঞ্জাত সন্তানও সহজেই জাতি-সদস্যের স্বীকৃতি পায়। এমনকি কয়েকটি উচ্চবর্ণের জাতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তারা সবর্ণের চাইতে কিছুটা নিচুস্তরের সমাজ থেকে মেয়েদের বিয়ে করে আনছে। তাদের সন্তানেরও কোনও কলঙ্ক হয় না, এবং তারা জাতি-সদস্য হিসাবেই গৃহীত হয়। এমনিতে সমাজে অবস্থানের উঁচু-নিচু ভেদ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এধরনের সামাজিক মর্যাদা তেমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন উচ্চবর্ণের জাতিই সমাজে নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদার আসন দাবি করে এসেছে, এবং অন্যদের দাবির ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি আরও বেশি। বহু শূদ্র জাতিই সমাজে তাদের অবস্থানকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করার প্রচেষ্টায় নিজেদের অতীতকে গৌরবান্বিত দেখাতে নতুন নতুন কিংবদন্তী তৈরি করেছে। উপবীত ধারণের অধিকারের জন্য এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সমাজকর্তাদের 'সন্তুষ্ট' করতে পারলে সেই অধিকারও তারা পেয়ে যায়। অস্পৃশ্য জাতিগুলির নিজেদের মধ্যেও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের মালা সম্প্রদায় মাদিগা-দের চাইতে নিজেদের উঁচু মনে করে। মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায় নিজেদের অন্য দলিত জাত ধেড়, মাঙ্গ প্রভৃতির চাইতে উঁচুতে মনে করে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চামার সম্প্রদায়কে আবার তফসিলভুক্ত জনজাতির মধ্যে উপরের দিকে জায়গা দেওয়া হয়।

সমাজে উঁচু-নিচু অবস্থানের তারতম্যের সঙ্গে পেশার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচার-সংস্কারগত পার্থক্য ছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাও স্বীকৃত রীতি। একই ব্যবস্থা বর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রযোজ্য। তবে কে কতটা 'শুদ্ধ' তা জন্মসূত্রেই অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। মোটামুটি নিয়ম হল, 'শুদ্ধ' ও 'মহৎ' পেশায় যুক্ত জাতি সমাজে উঁচু মর্যাদার আসন পাবে। 'অশুচি' এবং কলুষিত পেশার মানুষ সমাজের নিচের তলায় জায়গা পাবে। জ্ঞানচর্চা, বিদ্যাদান ও পূজার্চনা ইত্যাদি 'পবিত্র ও মহৎ' পেশা, তাই ব্রাহ্মণ সমাজ সর্বোচ্চ সম্মানের

অধিকারী। চর্মকারের পেশা, জঞ্জাল সাফাই, মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজকে 'অশুচি' ও 'কলুষিত' বলে ধরা হয়। তাই ওই সব পেশায় নিযুক্ত জাতির স্থান হয়েছে সমাজের সবচেয়ে নিচুতলায়। এই শুচি-অশুচি, পবিত্র-অপবিত্র ইত্যাদি ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির আন্তঃসম্পর্কেও ছায়া ফেলেছে। শুচি-অশুচি, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা হিন্দু মানসিকতারই অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবে এখন সমাজ বদলাতে শুরু করেছে। বাস্তব পরিস্থিতি সনাতন-পরম্পরা থেকে মানুষকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সাধারণ রীতির কথা বলা যায়। যে জাতির অবস্থান সমাজে যত উঁচুতে, 'শুদ্ধতা' বজায় রাখা ও ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার জন্য তাদের আচার-সংস্কার তত জটিল। জাত-এর ক্ষেত্রে ছোঁয়াছুঁয়ি জনিত দোষ ঘটে দু'ভাবে—একত্র ভোজন ও শারীরিক সংস্পর্শ থেকে। খাওয়ার বেলায় ছোঁয়াছুঁয়ির দোষবিচারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—কোন্ খাবার? কোন্ জাতের মানুষ রান্না করেছে? কোন্ জাতের মানুষের সঙ্গে একত্রে বসে তা খাওয়া হচ্ছে? ইত্যাদি। গুণবিচারে সবচেয়ে উন্নত বা শুদ্ধ আহার হল সাত্ত্বিক আহার—ফলমূল, দুধ এবং সাধারণভাবে নিরামিষ খাবার। এমনকি নিচু জাতের মানুষের এনে দেওয়া ফল খেলে ব্রাহ্মণেরও দোষ হয় না। তবে খাওয়ার আগে সেই ফল, অপেক্ষাকৃত কম-নিচু জাতের মানুষের এনে দেওয়া জলে ধুয়ে নিতে হবে, এবং পরিষ্কার কাপড়ে তা মুছে নিতে হবে। দুধ ও দইয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা আছে, কারণ দুটোই তরল পদার্থ এবং উভয় ক্ষেত্রেই অশুচি হাতে আনা জল মেশানোর সুযোগ রয়েছে। এসব কারণেই বেশির ভাগ গ্রামে বর্ণহিন্দু ও নিচুজাতের মানুষের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাতে আলাদা আলাদা কুয়োর ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কুয়ো একটা থাকে, তাহলে শুধুমাত্র উঁচুজাতের মানুষ তা ব্যবহার করার অধিকারী। নিচুজাতের মানুষ সেখান থেকে জল নিতে পারে না। পরম্পরাগত পেশা হিসাবে জলবাহকের কাজটা চতুর্থবর্ণের অর্থাৎ শূদ্র জাতির মানুষ করে। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব বর্ণের মানুষই সাধারণত তাদের ছোঁয়া জল ব্যবহার করে থাকে। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে শুদ্ধতার মাপকাঠিতে সমমর্যাদাভুক্ত মানুষ, তাও শুদ্ধাচারে জল আনলে তবেই তা ব্যবহারের যোগ্য বিবেচিত হবে।

রাজসিক ও তামসিক আহারের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। অঞ্চল ভেদে দুইয়ের সংজ্ঞারও অনেক পার্থক্য হতে দেখা যায়। হরিণের মাংস রাজসিক আহার। তেমনই, দ্রাক্ষারসসঞ্জাত মদিরা বা অন্য যে সব ফল 'অশুদ্ধ' নয়, তাদের রস থেকে তৈরি মদিরাও রাজসিক পানীয়। পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সব্জি তামসিক আহার্যতালিকায় রয়েছে। মহিষ ও শূকর মাংস একই কারণে তামসিক। কিন্তু বুনোশুয়োর ও বন মোরগের মাংস গৃহপালিত শুয়োর ও মুরগির তুলনায় কিছুটা শুদ্ধাহার বলে মনে করা হয়।

সাধারণত ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতের মানুষই সাত্ত্বিক আহার করে বলে মনে করা হলেও এর অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কাশ্মীরি পণ্ডিত, মহারাষ্ট্রের সারস্বত এবং বাংলা ও ওড়িশার ব্রাহ্মণরা মাছ-মাংস খেয়ে থাকেন। ক্ষত্রিয়ের আহার হল রাজসিক, এবং শূদ্রের তামসিক। চতুর্বর্ণেরও নিচে যারা, সেই সব জাত নিষিদ্ধ খাবারও খেতে পারে।

খাবার 'কাঁচা' না 'পাকা', তা নিয়েও 'শুদ্ধ' জাতগুলির ভেদ-বিচার আছে। 'কাঁচা' খাবার তৈরির ক্ষেত্রে জল লাগে। 'পাকা' খাবার রান্নায় দরকার হয় তেল, তবে ঘি হলে আরও ভাল। পাকা খাবারের বেলায়, যেমন আটা-ময়দা মাখতে জলের বদলে দুধ দিতে হবে। পরমান্ন বা পায়েস রান্না করতে হলে চাল-কে আগে ঘি দিয়ে সামান্য ভেজে নিতে হবে। 'কাঁচা' খাবার যে কোনও জাতের মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করা যায় না। শুধু তুলনায় উঁচু জাতের মানুষের কাছ থেকেই নেওয়া চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমমর্যাদার জাত হলেও চলে। 'পাকা' খাবারের ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা শিথিল। তবে 'শুদ্ধ' জাতের মানুষ কোনও অবস্থাতেই ধোপা-নাপিত ইত্যাদি 'অশুদ্ধ' শূদ্রের দেওয়া পাকা খাবারও খাবে না। আর 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত জাতের ছোঁয়া কোনও খাবারই চার বর্ণের কোন জাত-ই খায় না।

বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে পংক্তি ভোজনের নিয়মটিও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর ভাবে জটিল। একই জাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেও পংক্তি ভোজনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বলা হয়, তিন কনৌজিয়া— তেরহা চুলাহ। কিছুটা অতিশয়োক্তি হলেও ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা কতটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে যেতে পারে, এটা তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। নিয়মের কড়াকড়ি 'পাকা' খাবারের চাইতে 'কাঁচা' খাবারের বেলায় অনেক বেশি। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে কোন্ জাত কার সঙ্গে কতটা দূরত্ব বজায় রাখে, তা বিয়ে-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণেই বোঝা যায়। এমনকি কোনও সামাজিক 'অপরাধ' থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আয়োজিত সামাজিক ভোজ অনুষ্ঠানেও এটা চোখে পড়ে। এই সব সামাজিক ভোজে নিমন্ত্রিতদের জাতি-বর্ণ-সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা আলাদা পংক্তি ভোজনে বসার ব্যবস্থা থেকেই অঞ্চল বিশেষের কে উঁচু জাত, কে নিচু জাত তা বোঝা যায়।

আহারের মতোই নিচু জাতের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শ দোষ বাঁচিয়ে চলারও বিধান রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই অস্পৃশ্যতার উৎকট নমুনা দেখা যায়। সেখানে নিচু জাতের মানুষকে চোখে দেখাটাই স্পর্শ দোষ বলে ধরা হত। কিছু 'অস্পৃশ্য' জাতের মানুষের ছায়া মাড়ালেও পাপ হত। তামিলনাড়ু ও কেরলে একসময় ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার এই আকার নিয়েছিল। কেরলের 'তাইয়ান' (তাড়িসংগ্রহকারী) পেশার মানুষদের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ থেকে ৩৬ পা' দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হত। 'পুলিয়ান' (চাষী)-দের

দূরত্ব বজায় রাখতে হত ৯৬ পা'। অস্পৃশ্যতার সবচেয়ে প্রচলিত ও কম কড়া নিয়মটি হল, 'অস্পৃশ্য'দের উঁচু জাতের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে এবং তারা উঁচু জাতের মানুষের বাড়িতে পা দেবে না। তাদের মন্দিরে ঢোকা নিষেধ, গ্রামের বারোয়ারি কুয়ো থেকে জল নেওয়াও নিষিদ্ধ। গ্রামের বাইরে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে তাদের ঘরবসতি হবে। স্কুলে অস্পৃশ্য জাতের ছাত্রদের বসার জায়গাও অন্যদের চাইতে দূরে, ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বসতে হত। এমনকি গ্রামের চায়ের দোকানেও তাদের চা খাওয়ার জন্য আলাদা কাপ নির্দিষ্ট থাকত, যা খাওয়ার পরে তাদেরই ধুয়ে দিতে হত। আইন করে অস্পৃশ্যতা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের চোখে উঁচু জাত নিচু জাত সবাই সমান হলেও বাস্তবে এখনও তার প্রতিফলন কম। সমাজে এখনও এধরণের দ্বেষমূলক ভেদভাব রয়েছে অনেক সময়েই তা প্রকাশ্যে না হলেও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পায়।

কোনও একটি জাতের সব মানুষের পক্ষে একই সাধারণ সংস্কৃতির শরিক হওয়ার প্রবণতা এখনকার তুলনায় অতীতেই বেশি ছিল। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য তখনও ছিল। তবে তখনকার দিনে বেশিরভাগ জাতই কোনও না কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বসবাস করত। ফলে, নিজেদের জাত-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তারা তাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে তুলত। রাজপুতরা ব্যতিক্রম। অঞ্চল ভেদে রাজপুতদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার ব্যবহারে বড় রকমের প্রভেদ দেখা যায়। এছাড়া রাজপুতরা সবর্ণের মধ্যে বিবাহরীতি মানত না। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজপুতদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থাকলেও এই একটা বিষয়ে লক্ষ্যণীয় মিল, তারা অন্য জাতের সঙ্গে বিবাহে আপত্তি করত না। বিত্ত ও শক্তির দৌলতে সমাজের কিছু অংশ এভাবে এমন কয়েকটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে, যা সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

সামাজিক বিবাদ বা সমস্যা মেটানোর জন্য গ্রামে গ্রামে প্রায় সব জাতেরই নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। এধরণের সমস্যায় একাধিক গ্রাম জড়িয়ে পড়লেও জাত-পঞ্চায়েত তা নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা নিত। এখন এই ব্যবস্থার ভিত আলগা হয়ে এসেছে, তবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। পরে পঞ্চম পরিচ্ছেদে এনিয়ে আলোচনা করা হবে।

সামাজিক আচার-বিচার ও মেলামেশার মাপকাঠিতে আগে সমাজে বিভিন্ন জাতের যে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অবস্থান ছিল, সেই ভেদরেখাও এখন অনেকটাই মুছে এসেছে। তবে একেবারে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে জাত-পাত আবার শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসমর্থন সংগঠিত করতে সামাজিক ভিত্তি দরকার। জাত-সংহতি, জাত-আনুগত্য তাই বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। তাই নির্বাচনে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে জাতপাতের রাজনীতি এখন বহুল ব্যবহৃত কৌশল। কিন্তু এখনও বেশির ভাগ নির্বাচন কেন্দ্রেই একই জাতের প্রতিনিধিদের

মধ্যে ভোটের লড়াই হওয়ায় জাতপাতের অঙ্ক রাজনীতিতে কাজে আসছে না। অন্য একটি প্রবণতাও চোখে পড়ে—অপেক্ষাকৃত ধনী ও ক্ষমতাশালী জাতগুলি গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে নিজেরা জোটবদ্ধ হয়। নিচুজাতের মানুষকে এভাবে পদানত রাখতে উঁচু জাতের মানুষ তাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর জন্যই সন্ত্রাসের আশ্রয়ও নেয়। বিদ্রোহের সামান্যতম ইঙ্গিত দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা বলপ্রয়োগে দমন করা হয়। এজন্য খুন, ধর্ষণ করতেও তারা পিছ-পা নয়। সেই সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করা—কোনটাই বাদ যায় না। গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষকে জোর করে প্রভাবশালী ব্যক্তির পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করিয়ে, অথবা একেবারেই ভোট দিতে না দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সব মিলিয়ে, জাতপাতের সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতি মিশে যাওয়ায় দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা পরিবেশ নষ্ট হতে বসেছে।

ভারতের এই জাত-পাত নিয়ে দেশের ভিতরে ও বাইরে কম সমালোচনা হয়নি। তা সত্ত্বেও বর্ণ ও জাতপাত ব্যবস্থা টিঁকে থাকার ও নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত যত আঘাত এসেছে, এই ব্যবস্থা তা সামলে নিয়েছে। যুগ পরিবর্তনের সাথে বর্ণ ব্যবস্থাও নিজেকে সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত করে তুলেছে। যেমন, অস্পৃশ্যতা বা ছোঁয়াছুঁয়ির কড়া বিধান এখন অনেকটাই আলগা বা শিথিল হয়ে এসেছে। একই ভাবে শিথিল হয়েছে পংক্তিভোজন, জাত-পেশার বাধানিষেধও। অন্যদিকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতপাত গুরুত্বপূর্ণ নতুন ভূমিকা নিয়ে মাথা তুলেছে। তাই স্বাধীনতার 40 বছর পরেও ভারতীয় সমাজে বর্ণবিচার, জাতপাত নিয়ে নতুন করে শক্তিলাভ করছে।

আগের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, কীভাবে এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকেই খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামকে এদেশের বর্ণব্যবস্থার মোকাবিলা করতে হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামকে বর্ণ ও জাতপাতের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে হয়েছে, যা আদৌ তাদের ধর্মাচারে ছিল না। বিস্ময়জনক ভাবে এখনও এদেশের খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে ওই সব বৈশিষ্ট্যের জের বজায় রয়েছে।

খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে অবশ্যই চতুর্বর্ণের ভাগ নেই। কিন্তু ওই দুই সমাজে ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। উচ্চবর্ণ সমাজ থেকে ধর্মান্তরিতরা নিজেদের ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান, নায়ার-খ্রীষ্টান, রাজপুত বা ত্যাগী মুসলমান ইত্যাদি পরিচয়ে চিহ্নিত করে। এ বিষয়ে মণ্ডল কমিশনের (1980) মন্তব্য : "...... মানসিকতার গঠনে জাতপাত বিরাট মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনায় তা এমন ছাপ ফেলেছে, যা সহজে মোছার নয়।"

1988 সালের জানুয়ারিতে তামিলনাড়ুর বিশপদের বার্ষিক সম্মেলনের প্রতিবেদনে

বলা হয়েছে, "ধর্মান্তকরণের পরেও তফসিলভুক্ত কাস্ট খ্রীষ্টানরা সমাজে সনাতন অস্পৃশ্যতার শিকার হয়ে চলেছে। ফলে, সামাজিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক ক্ষেত্রে এখনও তারা চরমভাবে বঞ্চিত।" 1988 সালের ফেব্রুয়ারি নিজেদের মধ্যে বিতরিত এক খোলা চিঠিতে তামিলনাড়ুর ক্যাথলিক বিশপরা স্বীকার করেন, "জাতপাতের বিভেদ ও তার জেরে সামাজিক অন্যায় ও হিংসার ঘটনা খ্রীষ্টান সমাজের দৈনন্দিন জীবনেও প্রতিনিয়ত ঘটছে। আমরা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত, কিন্তু যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গেই পরিস্থিতি মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছি।" ভারতীয় চার্চ এখন স্বীকার করছে যে এদেশের এক কোটি 90 লক্ষ খ্রীষ্টানের 60 শতাংশকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্রীষ্টান বা তার চাইতেও নিচু স্তরের ধরে নিয়ে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে তফসিল সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান সমাজে প্রবেশ করলে তাদের আলাদা জনবসতিতে থাকতে বাধ্য করা হয়। গির্জাতেও তাদের আলাদা করে দেখা হয়। সাধারণ খ্রীষ্টান সমাজ থেকে দূরে তাদের বসবাসের জন্য কলোনি স্থাপন করতে হয়। সাধারণ পুর-সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। গির্জায় প্রার্থনা করার সময় 'নিম্ন জাতের' খ্রীষ্টানদের বসার জায়গা হয় ডানদিকের সারিতে, অন্যদের থেকে আলাদা। গির্জায় উপাসনার সময় বাইবেল পাঠ বা অন্য কোনও ভাবে পাদ্রিকে সহায়তা করার ভূমিকাও তাদের দেওয়া হয় না। জন্মের পর ব্যাপটিজম বা নামকরণের সূত্রে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদান, দীক্ষান্তে খ্রীষ্ট সমাজের পূর্ণ অধিকার লাভ ও বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিচু জাতের খ্রীষ্টানরা সবার শেষে পাদ্রির আশীর্বাদ পায়। এমনকি মূল খ্রীষ্টিয় সমাজের রাস্তা দিয়ে নিচু জাতের খ্রীষ্টানরা বিয়ের শোভাযাত্রা বা শবানুগমনও করতে পারে না। তফসিল-খ্রীষ্টানদের জন্য কবরস্থানও আলাদা। তাদের কারও মৃত্যু হলে গির্জায় ঘণ্টা বাজে না। পাদ্রিও মৃতের বাড়িতে প্রার্থনা করতে যায় না। মৃতদেহ কবর দেওয়ার আগে খ্রীষ্টিয় রীতিতে গির্জায় ধর্মীয় অন্তিম ক্রিয়ার (ফিউনারেল সার্ভিস) জন্য নিয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের নেই। উঁচু জাত ও নিচু জাতের খ্রীষ্টানদের মধ্যে একত্র ভোজন বা বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না। খ্রীষ্টসমাজের এই দুই 'জাত'-এর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও বিরল নয়। নিচু জাতের খ্রীষ্টানরা তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নীত করার চেষ্টায় লড়াই চালাচ্ছে। চার্চও তাতে সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত খুব সামান্য পরিবর্তনই দেখা গিয়েছে। জাতপাতের রেশ উঁচু জাতের খ্রীষ্টানদের নিজেদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যেও থেকে গিয়েছে। এবং তাদের সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে জাতপাতের এই বিচার সূক্ষ্মভাবে হলেও ছায়া ফেলে।

মুসলমান সমাজের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। মসজিদে ঢোকার অধিকার সবারই আছে, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটাও তেমন জোরাল নয়। তাহলেও বর্ণ ও জাতপাতের ভেদাভেদের মতোই মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের

সীমারেখা টানা আছে। ওই বিভেদরেখাই সমানে মর্যাদার অবস্থান ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নিষেধের গণ্ডী টেনে দিয়েছে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আসরফি ও আজলফ—ভেদাভেদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে 'শরিফ-জাত' ও 'আজলফ-জাত'-এর কথা বলেন। শরিফ-জাত অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, অনেকটা উঁচু জাতের সঙ্গে তুলনীয়। সাধারণ বংশজাত, বা নিচুজাতের সঙ্গে তুলনীয় হল আজলফ-জাত। মুসলমান সমাজে বিয়ে-শাদি, নিমন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিভেদরেখার কাজ করে। কে কোন বংশজাত, তা মুসলমান সমাজেও খেয়াল রাখা হয়। হিন্দুসমাজ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আগের মতোই তাদের জাত-পেশায় নিয়োজিত থাকে। মুঘল জমানায় সৈয়দ, শেখ, মুঘল ও পাঠান-কে প্রায়শই হিন্দুসমাজের চতুর্বর্ণ কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করা হত। দেশের কোনও কোনও প্রান্তে ধর্মান্তরিত মুসলমানকে এই চার 'বর্ণ'-এর মধ্যে কোনও একটিতে নিজেদের জায়গা করে নিতে হত। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এই রীতি ঠিক, না বেঠিক, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখনও তা চলছে, এটাই বাস্তব। পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কন্যার বংশজাতরা সৈয়দ, তারা আরব দেশের মানুষ। কিন্তু এদেশের অনেক উচ্চবর্ণের মানুষই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর নিজেদের সৈয়দ বলে পরিচয় দেয়। যে সব ব্রাহ্মণে মুসলমান হয়েছে, তাদের দাবি হল সম্রাট আকবরই তাদের এই স্বীকৃতি অনুমোদন করে গেছেন। পয়গম্বরের বংশোদ্ভূত না হলেও শেখরাও আরব দেশ থেকেই এসেছিল। কিন্তু এদেশে প্রথম প্রজন্মের ধর্মান্তরিত মানুষকে নিজেদের শেখ বলে পরিচয় দিতে দেখা গেছে। দিল্লির শাসক শ্রেণী, অর্থাৎ মুঘলদের অবস্থান শেখদের পরেই। মুঘলরা তুর্কী বংশোদ্ভূত। কিন্তু তুরস্কের অটোমান শাসকশ্রেণী থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তারা নিজেদের মুঘল পরিচয়ে পরিচিত করেছিল। পাঠানরা সাধারণভাবে আফগান বংশোদ্ভূত, যদিও আফগানিস্থানের সঙ্গে অনেকেরই সামান্যতম সম্পর্কও ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পাঠান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেনি। মুসলমান সমাজের উপরতলায় ওঠার জন্য এরকম বহু উল্লম্ফনের নজির পাওয়া যায়। 'গত বছর আমি ছিলাম জোলা, এ বছর হয়েছি শেখ, আর সামনের বছর যদি ফসল ভাল হয়, তাহলে আমি সৈয়দ হব।' একটু নিম্নরুচির হলেও এই রসিকতা থেকে সমাজে ওঠার এই প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজপুত, জাঠ ও আহির প্রভৃতি উঁচু জাতের মানুষ মুসলমান সমাজে এসেও নিজেদের পূর্ব পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান ধরে রেখেছিল। মুসলমান সমাজের জোলা, তেলি, ভাট, কালাল ও ভিস্তি প্রভৃতি সম্প্রদায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন পেশার কারণে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে জায়গা পেয়েছে। এ দিক থেকে তারা হিন্দু সমাজের পেশাভিত্তিক জাতগুলির সমতুল্য। ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ ও সমাজ সংস্কারকদের উদ্বেগের কারণ হলেও জাতপাত মুসলমান সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে। এমনকি সাম্প্রতিক মৌলবাদী উত্থানও তাকে দূর করতে পারেনি।

বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ—ভারতের মাটিতেই জন্ম নেওয়া এই তিন ধর্মের সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতপাতের বিচার দেখা যায়। নয়া-বৌদ্ধরা তাদের ফেলে আসা জাত-অবস্থান থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে নি। শিখধর্মের সাম্যচেতনাও ধাক্কা খেয়েছে জাতপাত ও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের কাছে।

বর্ণব্যবস্থা ও জাতপাতের প্রভাব এতটাই বেশি যে তা হিন্দুধর্মের সীমানা অতিক্রম করে গোটা ভারতীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সমাজ সংস্কারকরা অনেক চেষ্টা করেও এই প্রবণতাকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে পারেন নি।

আধুনিকতা ও সনাতনী ধারণা, এই দুই শক্তির প্রবল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এখনকার ভারতীয় সমাজ এগোচ্ছে। এই পরস্পরবিরোধী সংঘাতের বেশ কিছু অদ্ভুত ফল ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। একদিকে ভারতীয় সমাজ গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়চেতনাকে গ্রহণ করে তুলে ধরছে। অন্যদিকে, জাতপাতকেন্দ্রিক আদিম গোষ্ঠী-আনুগত্য এখনও সমাজের ভিত্তিতে শিকড় গেড়ে রয়েছে। সমাজ থেকে শোষণব্যবস্থা নির্মূল করার কোনও আন্তরিক প্রচেষ্টাই হয় নি। বরং রাজনৈতিক ফয়দার দিকে লক্ষ রেখে সনাতনী আচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার রীতি অব্যাহত। ধর্মীয় উন্মাদনা ও মৌলবাদকে কড়া হাতে দমন করার চেষ্টাই হয়নি। বর্ণ ও জাতপাতের কাঠামোয় নিহত অমানবিকতা ও বৈষম্যের কথা ভারতীয় সমাজের আবেগ ও সচেতন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে, নিন্দাও করে। কিন্তু মুখে এ কথা স্বীকার করলেও তা নির্মূল করার সত্যিকারের চেষ্টাই হয়নি। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই তফসিল জনজাতি, আদিবাসী ও অন্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ। দেশের মোট কৃষিজমির মাত্র 10 শতাংশ তাদের হাতে। গরিব মানুষ—বিশেষ করে ভূমিদাস ও একেবারে 'নিচু' পেশায় যুক্ত মানুষদের সামনে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের তেমন কোনও রাস্তাই খোলা নেই। ভূমিদাস প্রথার বিলোপ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তা অন্য ধরণের দাস প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতে এখনও 41,00,000 খাটা পায়খানা রয়েছে, যা সাফ করতে এখনও একটি বিশেষ জাতের মানুষকে মাথায় করে মলমূত্র বহন করতে হয়। বর্ণ ও জাতপাত এখন রাজনীতির আধার হওয়ায় নিচু জাতের মানুষের উপর অত্যাচার অন্য চেহারা নিয়েছে। নিচু জাত ভোটের অধিকার প্রয়োগ করে যাতে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী না হতে পারে, সেজন্য তাদের ভোট দিতেই বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিছু এলাকায় জাত-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে এলেও অন্যত্র তা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। ভারতীয় সমাজ, তার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এ পর্যন্ত শুধু দলিত ও দুর্বল অনগ্রসরদের জন্য কুম্ভীরাশ্রুই বিসর্জন করেছে। কিন্তু তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে পারেনি। সহজবোধ্য কারণেই দেখা দিচ্ছে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ। ঐতিহ্যের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার দোহাই দিয়ে শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায় অবিচার অব্যাহত রাখার কোনও যুক্তি নেই। বর্ণ ও জাতপাতের বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন

এলেও তা নিতান্তই কম, এবং তা এসেছেও খুবই ধীরগতিতে। আইন একহাতে অনেক কিছু দিয়েছে—অস্পৃশ্যতা ও ভূমিদাস প্রথা বিলোপ, চাকুরি ও শিক্ষাব্যবস্থায় সংরক্ষণের মাধ্যমে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষকে সুযোগ দান, জাতপাতের বিচারের বাইরে বিয়ের সুযোগ ইত্যাদি। আবার আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে চরম শিথিলতা কেড়ে নিয়েছে এ সবের অনেকটাই।

চার

পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

এই পরিচ্ছেদে পরিবারের গঠন ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। একই সঙ্গে আলোচিত হবে আত্মীয়তার বন্ধন সূত্র নিয়েও। এই দুয়ের সঙ্গেই বিবাহ রীতি সম্পর্কেও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে। কারণ, পরিবার ও আত্মীয়তা ব্যবস্থায় বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পরিবার

পরিবার কথাটি একটি পরিচিত শব্দ, এবং মোটামুটিভাবে এই কথার অর্থও বহুল পরিচিত। পরিবার কথাটির মধ্যে ধরার চেষ্টা হয়েছে এমন একটি সার্বিক চেতনাকে, যা যৌন সম্পর্ক ও সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিয়েছে। পরিবারের অন্য বৈশিষ্ট্য, পরিবারভুক্ত সদস্যরা একই আবাস ও একই গার্হস্থ্য পরিষেবা ভোগ করে। প্রাচীন ভারতে 'নিয়োগ প্রথা'র সূত্রে শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। এভাবে নিযুক্ত পুরুষ পরে ওই স্ত্রী বা তার সন্তানের উপর কোনও দাবি করতে পারত না। বরং নিয়োগপ্রথায় উৎপন্ন সন্তান তার বাবার বংশের পরিচয়েই পরিচিত হত। অতীতে নায়ারদের মধ্যে 'তালি' নামে এক আচার-প্রথা ছিল। ওই প্রথা অনুযায়ী নায়ার সম্প্রদায়ের একাধিক পুরুষ একই স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হতে পারত। 'তালি' হল একটি চেনে বাঁধা লকেট, যা মেয়েরা গলায় পরে থাকে। নায়ার সমাজের অন্তর্গত কোনও একটি উপগোষ্ঠীর সম্মানিত কোনও ব্যক্তি ওই লকেট তার গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের তরফে কোনও নারীর গলায় বেঁধে দিলে গোটা সম্প্রদায়ের পুরুষরাই তাদের 'সম্বন্ধনম' সম্পর্কের জোরে ওই নারীর শরীরের দাবিদার হতে পারবে। উচ্চ বর্ণের কোনও পুরুষ ওই নারীর প্রতি আকর্ষিত হলে, ওই নারীর সম্মতিক্রমে তিনিও এই অধিকার ভোগ করতে পারবেন। 'সম্বন্ধম' সম্পর্কে আবদ্ধ একই সম্প্রদায়ের পুরুষরা তাই বলে 'তালি' প্রথার জোরে ওই মহিলার উপর একচ্ছত্র অধিকার খাটাতে পারে না। স্বামীর অধিকার, বা সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার—কোনওটাই একচ্ছত্র নয়।

'তালি' প্রথায় আবদ্ধ কোনও নারী চাইলে নিজের ইচ্ছায় ওই পুরুষদের যৌন অধিকার যে কোনও সময় প্রত্যাহার করতে পারে। তার সন্তানদের দায়িত্ব ও অধিকার বর্তায় তার মাতৃকুলের 'তারওয়াড়' বা মাতৃকুলের আত্মীয় স্বজনদের উপর। নারী রজস্বলা হওয়ার পরে 'তালি' প্রথায় আবদ্ধ হওয়ার অর্থ নির্দিষ্ট নারীর সঙ্গে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সব পুরুষের বিবাহ হওয়া। সন্তানের জন্মের সময় সম্ভ্রান্ত কাউকে যাবতীয় খরচ বহন করতে হয়। 'আচার-পিতা' ও 'আইনী-পিতা' প্রথার মাধ্যমে সন্তানের জন্মকে সমাজ বৈধতার স্বীকৃতি দেয় এবং সন্তানের মাতাও সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়। যেহেতু, এই প্রথায় সন্তানের জন্মকে বৈধতা দেওয়া হয়, তাই 'তালি' প্রথাকে বিবাহ বলা যেতেই পারে। কিন্তু পরিবারের অন্য দুই বৈশিষ্ট্য এখানে অনুপস্থিত—একই বাসগৃহ ও একই গার্হস্থ্য পরিষেবার সুযোগসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা। 'তালি' প্রথায় দম্পতি অনেক সময়ই কোনও নির্দিষ্ট পরিবার হিসাবে একই গৃহে বাস করে না। লাক্ষাদ্বীপ ও মধ্য কেরলের একাধিক মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর পরিবারে স্বামীর ভূমিকা শুধুমাত্র নারীর যৌনক্রিয়ার নিশীথ সঙ্গী হওয়ার মধ্যেই সীমিত। পরিবারের অর্থনৈতিক দায় কর্তব্যে তার কোনও অংশ বা ভূমিকা নেই। নায়ার-নাম্বুদিরি 'সম্বন্ধম'-য়ে স্বামীর ভূমিকা আরও গৌণ। ওই সমাজে স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে একত্রে ভোজন পর্যন্ত করার অধিকারী নয়, অন্য গার্হস্থ্য কাজের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। এধরণের ব্যতিক্রমী পারিবারিক সম্পর্ক নৃতত্ত্ববিদদের যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। এর ফলে, বিবাহের এবং পরিবারের ন্যূনতম সংজ্ঞা কী হওয়া উচিত, তা নিয়েও অনেক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিতর্ক অমীমাংসিত থাকলেও আমাদের এখনই তা নিয়ে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। বিবাহ ও পরিবার—দুটো প্রতিষ্ঠানকে অচ্ছেদ্য বা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত না ধরলেও চলে। যে সম্পর্কের ফলে সন্তানের জন্মকে সমাজ বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছে, তাকেই বিবাহ বলে মেনে নেওয়া যায়। যদি স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বাস না করে নিজ নিজ মাতৃকুল পরিবারে থেকে যায় তাহলেও।

ভারতীয় সমাজে পরিবারের আকার বা চেহারার ক্ষেত্রেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। পরিবারের এই বৈচিত্র্য ধরা পড়ে বংশধারা, নিবাস, পরিবারের সদস্যপদ ও জীবনসঙ্গীর সংখ্যার বৈশিষ্ট্য।

বেশির ভাগ ভারতীয় গোষ্ঠীর পরিবারেই পিতার বংশধারা অনুসৃত হয়, যা পিতৃকুল বলে পরিচিত। মাতৃকুলভিত্তিক সমাজের কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—যেমন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গারো, খাসি ও নার (PNAR)। নায়ার ও মোপলা, লাক্ষাদ্বীপের বাসিন্দারা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি আদিবাসী ও আদিবাসী নয়—এমন কিছু জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মাতৃকুল অনুযায়ী বংশধারা অনুসৃত হয়। এই দুই রীতির বাইরে মাতৃকুল-ঘেঁষা পরিবারের আরও কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে এবং কিছু আদিবাসী সমাজে। ওই সব

সমাজে দুই নিয়মের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তারা পিতার পদবি গ্রহণ করলেও বংশধারার ক্ষেত্রে মাতৃকুলকেই স্বীকার করে।

পিতৃকুল ও মাতৃকুল শব্দদুটির সঙ্গেই পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক—এই দুই শব্দও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু পরের দুটি শব্দের ব্যবহার অনেকটাই দায়সারা লঘু ও বিভ্রান্তিকর। পিতৃতন্ত্রের অর্থ, পুরুষপ্রধান বা পুরুষশাসিত সমাজকাঠামো, যা ভারতীয় সমাজের সিংহভাগের ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু মাতৃতন্ত্রের বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই। পরে 'লিঙ্গ সম্পর্ক' পরিচ্ছেদে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, মাতৃকুলভিত্তিক বংশধারা যে সমাজে প্রচলিত, সেখানে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই তাদের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। ওই সব সমাজেও সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষের হাতেই ন্যস্ত।

বিবাহের পর দম্পতির নিবাস কোথায় হবে, এ ব্যাপারেও ভারতীয় সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রচলন আছে। বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে যায়। শ্বশুরের অবর্তমানে খুড়শ্বশুর বা দাদাশ্বশুরের বাড়িতেও স্বামীর সঙ্গে বাস করার রীতি ছিল। এ ধরণের পরিবার-ব্যবস্থাকে বলে 'প্যাট্রিলোকাল' (Patrilocal), অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় মেয়েরা নিজের ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে আসবে। এর বিপরীত ব্যবস্থাকে বলে 'ম্যাট্রিলোকাল' (Matrilocal), যেখানে মেয়েরা নিজের মায়ের পরিবারেই থাকবে, বিয়ের পর ছেলেরা স্ত্রীর ঘর করতে আসবে। ভারতীয় সমাজে প্রথমটাই বেশি প্রচলিত। তবে খাসি, নায়ার ও বেশ কয়েকটি মাতৃকুলভিত্তিক গোষ্ঠীতে দ্বিতীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অন্যদিকে, একাধিক আদিবাসী সমাজের রীতি হল, বিয়ের পর দম্পতি নতুন আবাসে উঠে যায়। এই 'নিওলোকাল' (Neolocal) ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণত বিয়ের পর মেয়ে বা ছেলের বাড়িতে কিছুদিন একসঙ্গে কাটিয়ে তারপরে দম্পতি নতুন বাড়িতে সংসার পাতে। লাক্ষাদ্বীপ ও মধ্য কেরলের কয়েকটি সম্প্রদায়ের নিবাস সংক্রান্ত নিয়মকে 'ডুয়োলোকাল' (Duolocal) বলা যায়। সেখানে স্বামী তার মায়ের পরিবারের সঙ্গে থেকে যায়, স্ত্রী থেকে যায় তার মায়ের পরিবারে।

ভারতকে অনেকসময়ই 'যৌথপরিবার'-এর দেশ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বইয়ে 'যৌথ পরিবার' অভিধাটি কমই ব্যবহৃত হয়। সেখানে বরং 'ছোট' পরিবার (Nucleur)এবং 'বর্ধিত পরিবার' (Extended) -এর মধ্যে তফাৎ করা হয়। প্রচলিত অর্থে যা যৌথ পরিবার, বর্ধিত পরিবার বলতে তাই বোঝায়। ছোট পরিবার বলতে দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততিকে বোঝায়। অন্যদিকে, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বলতে দুই তিন বা তারও বেশি পুরুষের বংশধারা, তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, সবাইকে বোঝায়। মাতৃকুলভিত্তিক সমাজের বর্ধিত পরিবারে অবশ্য স্বামীদের ধরা হয় না। ভারতীয় সমাজে সবসময় ছোট পরিবারই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে বেশির ভাগ ছোট পরিবারই ক্রমে বর্ধিত পরিবারে পরিণত হয় ও পরে আবার ছোট ছোট পরিবারে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের দুই-তিন পুরুষের সব সদস্য একত্রে বাস করছে, এরকম নজির দুর্লভ। এমনিতেই যে কোনও বাড়িতে পরিবারের কত বেশি সদস্য একত্রে বসবাস করতে পারে, তার একটা সীমা আছে। গার্হস্থ্য বিবাদের পরিণতিতে প্রায়ই পরিবারের সদস্যারা আলাদা বাড়িতে উঠে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের একই পারিবারিক গোষ্ঠীভুক্ত বলা যেতে পারে। খুব বড়সড় বর্ধিত পরিবারের সদস্যরা একত্রে বাস করলেও করতে পারে। এমনকি তাদের অর্থকরী আয়ের উৎসও একই হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পারিবারিক গোষ্ঠীভুক্ত ছোট ছোট পরিবারের আলাদা আলাদা গার্হস্থ্য সেবার ব্যবস্থা থাকে। ক্রমশই তারা 'পৃথগন্ন' হয়ে যায় অর্থাৎ আলাদা হেঁসেল ব্যবস্থা (Sepcrate hearths—Chulhas) শুরু করে। যেখানে পারিবারিক সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা হয়নি, সেই ক্ষেত্রেও আলাদা হয়ে যাওয়া ছোট পরিবারগুলি যৌথ পরিবারের কিছু নিয়মরীতি আঁকড়ে থাকে। বিয়ে বা মৃত্যুর ঘটনায়, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিবারের সবাই একত্র হয়। যৌথ পরিবারের এই সংহতিকে খুব মহৎ গুণ বলে প্রচার করা হলেও এধরণের পরিবার তাদের পারিবারিক কোন্দল ও নানা সমস্যা থেকে মুক্ত নয়।

স্বামী ও স্ত্রী মিলে দম্পতি, এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী অথবা এক স্ত্রীর বহু স্বামী—জীবনসঙ্গীর সংখ্যার তারতম্য থেকেও পরিবার কাঠামোর রকমফের নির্দিষ্ট করা যায়। একদারপ্রথায় স্ত্রী বর্তমানে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে না। 1856 সালে বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ার আগে বর্ণহিন্দু সমাজের বিধবারা আর বিয়ে করতে পারত না। তাদের জন্য প্রথম বিবাহই শেষ কথা ছিল। এখন ভারতীয় সমাজেও পশ্চিমী রীতিতে স্ত্রী বা স্বামীর (মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত কারণে) অবর্তমানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বিবাহের নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছে। বহুবিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পুরুষ, দুই বা ততোধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, আবার স্ত্রীও দুই বা তার বেশি স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

এদেশে হিন্দু, মুসলমান এমনকি আদিবাসী সমাজেও বহুবিবাহের (পুরুষের জন্য) চল ভালভাবেই রয়েছে। 1955 সালে হিন্দু বিবাহ আইন পাস করিয়ে হিন্দুদের জন্য এক বিবাহ রীতি চালু করার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু জনগণনার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, কিছুটা সীমিতভাবে হলেও হিন্দুদের মধ্যে এখনও বহুবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে। আদিবাসী ও তফসিল জনজাতির ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পর্কীয় সনাতন প্রথাই বহাল রাখা হয়েছে, এমনকি খুবই স্পর্শকাতর বিষয় মনে করায় এদেশে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনেও (Muslim Personal Law) হাত দেওয়া হয়নি। মুসলমান ব্যক্তিগত আইনে পুরুষের বহুবিবাহ এবং চারজন পর্যন্ত স্ত্রী অনুমোদিত। যদিও পাকিস্তান সহ একাধিক মুসলমান প্রধান দেশ আইন করে বহুবিবাহের

কুপ্রথা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার, এদেশের মুসলমান মাত্রেরই চারজন করে বিবি থাকে না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1931-40 দশকে মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের হার ছিল 7.29 শতাংশ, 1941-50 দশকে তা কমে দাঁড়ায় 7.06 শতাংশে, পরবর্তী দশকে (অর্থাৎ 1951-60) ওই হার আরও কমে দাঁড়ায় 4.31 শতাংশে। একই সময়ে হিন্দুসমাজে বহু বিবাহের হার ছিল যথাক্রমে 6.79 7.15 এবং 5.06 শতাংশ। প্রায় এক লক্ষ বিবাহের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, উভয় সমাজেই বহু বিবাহের প্রবণতা কমছে, কমছে বহুবিবাহভিত্তিক পরিবারের সংখ্যাও।

দেশের কয়েকটি প্রত্যন্ত এলাকায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে এখনও নারীদের বহুবিবাহ প্রথা চালু আছে। উত্তরাঞ্চলের হিমাচল প্রদেশের কিন্নর, লাহুল-স্পিতি এলাকার মানুষ এবং উত্তরপ্রদেশের খাসা (জৌনসারি) সমাজে এই রীতি চালু। তফসিলভুক্ত হওয়ায় এই সব গোষ্ঠীর মানুষ হিন্দুবিবাহ আইনের আওতায় পড়ে না। ওই সব সমাজের রীতি অনুযায়ী পরিবারের সব ভাই একই স্ত্রীর স্বামী হিসাবে গণ্য হয়। পরিবারের বড় ভাই বিবাহ করলে বাকি সব ভাইও ওই স্ত্রীর স্বামী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভাইরা আরও বিবাহ করতেই পারে। এধরণের ব্যবস্থাকে 'গোষ্ঠী বিবাহ' বলা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের টোডা সমাজে স্ত্রীর একাধিক পতি থাকলেও তাদের ভাই হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এধরনের বিবাহ থেকে সন্তানের জন্মের পর পিতৃপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে। এই সমস্যার সমাধান করা হয় 'তীর-ধনুক' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। স্ত্রীর বহু-পতির মধ্যে যে কোনও একজন এই অনুষ্ঠান পালনের ভার নেয়। স্ত্রীর প্রথম গর্ভসঞ্চার হওয়ার পরেই ওই স্বামী তাকে ও কয়েকজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সেখানে একটি গাছের গুঁড়ির মধ্যে গর্ত করে সেখানে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ বসানো হয়। কাঠ কেটে স্বামী একটি ছোট তীর ও ধনুক তৈরি করে স্ত্রীর হাতে দেয়। স্ত্রী তা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে কপালে ঠেকায় এবং তারপর একদৃষ্টিতে প্রদীপের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না প্রদীপ নিভে যায়। তারপর স্বামী সেখানেই রান্না করে, দুজনেই খায় ও রাতে বনের মধ্যেই একসঙ্গে কাটিয়ে পরদিন তারা গ্রামে ফিরে আসে। স্ত্রীর বহুস্বামীর মধ্যে যে এই অনুষ্ঠান করে সেই তার সন্তানের পিতা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। স্ত্রীর পরবর্তী সব কয়টি সন্তানের ক্ষেত্রেও পিতৃত্বের পরিচয় ওই স্বামীরই কাঁধে চাপে, এমনকি তার মৃত্যুর পরে অন্য স্বামীর ঔরসে জন্মানো সন্তানের বেলাতেও পিতৃপরিচয় বদলায় না। পরবর্তী সময়ে ওই স্ত্রীর অন্য স্বামীদের কেউ একই 'তীর-ধনুক' অনুষ্ঠান করলে একমাত্র তখনই পরের সন্তানদের পিতৃপরিচয় বদলাতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে, টোডা সমাজে রক্তের সম্পর্কের চাইতেও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিতৃত্বের স্বীকৃতি অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।

কেরলের নায়ার সমাজেও মেয়েদের বহুবিবাহ প্রথা ছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু তা অন্তত 100 বছর আগের ঘটনা। উত্তর ভারতের একটি জাতের কথা এখানে প্রাসঙ্গিক। ভূস্বামীপ্রধান এই জাতের পরিবারের মধ্যে এখনও মেয়েদের বহুবিবাহ প্রথার রেশ রয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হয়। এই জাতের পরিবারে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে অন্য ছোট ভাইরাও যৌন সম্পর্ক করতে পারে। কিছু কিছু বিবরণ অনুযায়ী, এই অধিকার স্বামীর বড় ভাইরাও পেয়ে থাকে। বিধবা হলে তার উপর মৃত স্বামীর ছোট ভাইদের দাবি স্বীকৃত। 'কারেওয়া' প্রথা নামে পরিচিত এই ব্যবস্থায় ছোট ভাইরা বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গণ্য করে। যদি মৃতের কোনও অনুজ না থাকে, সেক্ষেত্রে অগ্রজ একই অধিকার পায়। শ্বশুরও বিধবা পুত্রবধূর উপর এই দাবি করতে পারে, এবং দাবি প্রতিষ্ঠার তাগিদে আদালতে ছোটার নজিরও আছে। তবে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার খাতিরে ওই জাতের মানুষজন এখন এ ধরণের প্রথার অস্তিত্বের কথা জোর গলায় অস্বীকার করে থাকে। এমনিতে অবশ্য ওই জাতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিবারে এই প্রথা লোপ পেয়েছে। কিন্তু কখনও কখনও ওই জাতে শিক্ষিত বধূকে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা পেতে হয়, যখন তার দেবররা পরম্পরাগত প্রথার জের টেনে নিজেদের 'অধিকার' দাবি করে বসে।

পরিবারের বিভিন্ন শাস্ত্রের পারস্পরিক আচরণবিধি কী হওয়া উচিত, তা মোটামুটিভাবে ঠিক করা আছে। যেমন, বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে, ভাই-বোন, বোনদের মধ্যে সম্পর্ক, শাশুড়ী পুত্রবধূ, স্বামী ও স্ত্রী, শ্যালক-ভগ্নিপতি, শ্যালিকা-ভ্রাতৃবধূর মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ। কিন্তু এই আচরণবিধি নেহাতই আদর্শ হিসাবে তৈরি, বাস্তবে তার অনেক রকমফের ঘটে। কোনও দুই সন্তানই যেমন এক ছাঁচে হয় না, তেমনই কোনও দুটি পরিবারের মধ্যেও মিল কমই। ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার-সংস্কার। এই ভিন্ন আচার-সংস্কারকে পরিবারের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাও চলে।

পরিবারের সদস্যদের বয়স, লিঙ্গ, আত্মীয়তা-সম্পর্ক—এসবের উপর ভিত্তি করেই তাদের পারস্পরিক আচরণবিধি তৈরি হয়। বয়সকে সম্মান জানানো হবে, এটাই প্রত্যাশিত। পিতৃকুলনির্ভর পরিবারে মেয়েরা পুরুষকে অগ্রাধিকার দেবে, এটাই ধরে নেওয়া হয়। আত্মীয় পরিজনের ক্ষেত্রেও সম্পর্কের গভীরতার তারতম্য অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রাখা হয়। স্ত্রী তার স্বামীর বাবা, কাকা বা বড়ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলবে। উত্তর ভারতের সনাতনী পরিবারগুলিতে বাড়ির বউকে এই সব সম্পর্কের গুরুজনদের সামনে ঘোমটা দিয়ে চলতে হয়। যদি কখনও কখনও কথা বলার দরকার পড়ে, তাহলেও যত কম কথায় সম্ভব কাজ সারতে হয়। যদি কাকা সম্পর্কের কেউ সমবয়সী, বা বয়সে ছোটও হয়, তাহলেও তাকে

গুরুজনোচিত প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হয়। আবার কিছু কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাড়তি অধিকার বা ছাড় দেওয়া আছে। উত্তর ভারতে জামাইবাবু-শ্যালিকা, বা বৌদি-দেবরের মধ্যে ঠাট্টার সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেই বেশ কিছু সম্পর্কেই আগের ঘনিষ্ঠতা কমে আসে। পরিবারের সদস্যরা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেই তাদের সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। বাইরে থেকে সম্পর্কের চেহারা একই থাকলেও আগের ঘনিষ্ঠতা হারিয়ে যায়।

আধুনিক যুগে পারিবারিক সংহতি ও সম্পর্ক নানা কারণে প্রভাবিত হয়ে চলেছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা, জাত-পেশা ছেড়ে নতুন পেশা গ্রহণ, আয়ের তারতম্য ইত্যাদি। এসবের প্রভাবে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনও হতে শুরু করেছে। পশ্চিমের 'লিভ ইন টুগেদার', 'সিংগল উওম্যান' বা অবিবাহিত মাতা-র মতো ব্যাপারস্যাপার এদেশে এখনও তেমন বড় মাত্রায় শুরু হয়নি ঠিকই। কিন্তু শহরের পরিবারগুলিতে ইতিমধ্যেই পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে।

বিবাহ

বিয়ের সূত্রেই পরিবার জন্ম নেয়। বিয়ের বন্ধনেই পরিবার বাঁধা থাকে। তাই, পরিবারের ক্ষেত্রে বিয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয় পরিজনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিয়ের ভূমিকা রয়েছে। পরিবার ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বোঝার জন্য বিয়ের ব্যাপারটার গভীর পর্যালোচনা জরুরী। বিয়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আগেই আলোচিত হয়েছে। এবার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তাকানো যাক।

প্রথমত, একজন মানুষ কোন কোন গোষ্ঠীতে বিয়ে করতে পারে, তা দেখা দরকার। স্ববর্ণ বিবাহ একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে দেয়, যা সমাজ অনুমোদিত। এ ধরণের গোষ্ঠী আদতে কোনও না কোনও জাত, বা তারই অংশ। কিন্তু এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ। অনুলোম বিবাহে নিচু জাতের মেয়ের সঙ্গে উঁচু জাতের ছেলের বিয়ে সিদ্ধ বা অনুমোদিত। তবে কত নিচু জাতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে, তা অঞ্চল বিশেষের প্রচলিত সামাজিক রীতির উপর নির্ভর করে। সামাজিক-নৃতত্ত্ববিদদের পরিভাষায় এ ধরণের বিবাহকে 'হাইপারগ্যামি'(Hypergamy) বলে। প্রতিলোম বিবাহ হয় উঁচু জাতের মেয়ের সঙ্গে নিচু জাতের ছেলের। নৃতত্ত্বের পরিভাষায় যার নাম 'হাইপোগ্যামি' (Hypogamy)। স্থানীয় ও আঞ্চলিক রীতিনীতির উপরই নির্ভর করে কোন কোন নিচু জাতের সঙ্গে বিবাহে সমাজ নিষেধের তর্জনি তুলবে না।

মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজে জাতপাতের অস্তিত্ব প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয় না। তাই এমনিতে যে কোনও দুজন মুসলমান পুরুষ ও নারী, বা যে কোনও খ্রীষ্টান পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হতেই পারে। আগেই লক্ষ্য করা হয়েছে,

বাস্তব চিত্রটা ঠিক এরকম নয়। মুসলমান সমাজে বিয়ের সময় আসরফ ও আজলফ ভেদাভেদ সামনে চলে আসে। ধর্মান্তরিতদের ফেলে আসা জাত-পরিচয়ও ভুলতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের খ্রীষ্টানরা তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষের জাত-পরিচয় মনে করে রাখ। এখনও মাঝে মধ্যেই সংবাদপত্রে বিবাহের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে সম্ভাব্য পাত্রকে 'ব্রাহ্মণ ক্যাথলিক' বা 'সারস্বত গোয়ান ক্রিশ্চান' হিসাবে পরিচয় দিতে দেখা যায়। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, সংখ্যায় অল্প হলেও হিন্দুদের একাংশ এখন প্রকাশ্যেই জাতপাতের নিষেধ অগ্রাহ্য করছে। বিয়ের বিজ্ঞাপনে 'অসবর্ণ চলিবে' বা 'কাস্ট নো বার' জাতীয় ঘোষণায় তা প্রমাণিত।

গোত্রান্তর বা ভিন্ন গোত্রে বিবাহের অন্য দিক হল, নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। হিন্দুরা স্বগোত্রের মধ্যে বিয়ে করে না, কারণ তারা মনে করে এক গোত্রের সব সদস্যের পূর্বপুরুষই ছিলেন অভিন্ন ব্যক্তি। যারা 'সপিণ্ড', তাদের মধ্যেও বিবাহ অসিদ্ধ। 'সপিণ্ড' কথাটির দুটি অর্থ করা হয় একটি অর্থ, যারা একই পূর্বপুরুষকে পিণ্ড উৎসর্গ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ, যারা একই শরীরের অংশ। বিয়ে প্রসঙ্গে গৌতমের ভাষা অনুসারে ছেলের দিকের ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ ও মেয়ের দিকের পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত 'সপিণ্ড' ধরা হবে। অর্থাৎ বিবাহেচ্ছু পাত্র পাত্রীর বাবা ও মায়ের দিকে যথাক্রমে সাত ও পাঁচ পুরুষের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকা চলবে না। অন্য ভাষ্যকাররা এই নিষেধের গণ্ডী কিছুটা ছোট করে দিয়েছেন। 1955 সালের হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীর বাবার দিকে পাঁচ পুরুষ ও মায়ের দিকে তিন পুরুষের মধ্যে আত্মীয়তা থাকলে বিয়ে হতে পারবে না। তবে স্থানীয় রীতি বিশেষে ব্যতিক্রম ঘটতেই পারে। আদিবাসীদের মধ্যেও বিয়ে অবশ্যই নিজের গোষ্ঠীর বাইরে হতে হবে। উত্তর ভারতের কোনও কোনও এলাকায় 'জায়গা'র বাইরে বিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। বিয়ের কনেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কন্যাদান করা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে গোত্রান্তরের নিয়ম নিয়ে এখনও হিন্দু সমাজে যথেষ্ট কড়াকড়ি আছে।

বিয়ের প্রস্তুতিপর্ব ও আয়োজন যেমন খুবই সরল-অনাড়ম্বর হয়, তেমনই জটিল ও সাড়ম্বরও হতে পারে। আদিবাসী সমাজে ছেলে ও মেয়ে নিজেরা পালিয়ে যেতে পারে। কিছুদিন পরে গ্রামে ফিরে সবাইকে একটা ছোটখাট ভোজ দিলেই হল। এরপরেই আদিবাসী সমাজ তাদের স্বামী-স্ত্রী বলে মেনে নেবে। সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট বা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের আওতায় আগাম নোটিশ দিয়ে যে কোনও ভারতীয় দম্পতিই বিয়ে করতে পারে। এজন্য তাদের একটা সামান্য ফি দিতে হয় এবং বিয়ের দুজন সাক্ষী রাখতে হয়। আর্যসমাজী বিয়ে বা মন্দিরে দেবদেবীর সামনে বিয়ে করার রীতিও হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয়। কিন্তু ঘটকালির মাধ্যমে বা সম্বন্ধ করে বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক সতর্ক পদক্ষেপ ও আলোচনা-দরকষাকষি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। 'রাজযোটক' বা 'পাল্টি ঘর' হলে সমস্যা অনেকটাই

মিটে যায়। যেমন, মুসলমানদের ক্ষেত্রে দুই ভাই বা দুই বোনের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে। আবার কোনও কোনও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ভাই-বোনের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে। দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রের কিছু জাতির মধ্যেও এই রীতির চল আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিছু হিন্দু জাতিগোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী মামা-ভাগ্নির বিয়ের সম্বন্ধ সবচেয়ে ভাল। এধরণের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্ববর্ণে বিবাহের নিয়ম আক্ষরিক অর্থে পালিত হয়। অন্যদিকে, সম্পত্তি লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি এড়ানও সম্ভব হয়। মেয়েকে বিয়ের সময় দানসামগ্রী হিসাবে যা দেওয়া হয়, নিজের ছোট ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় সেটাই ফিরে আসে। আত্মীয় স্বজনদের গণ্ডীর বাইরে বিয়ের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। যেমন, পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, ছেলে বা মেয়ের চরিত্র, দানসামগ্রী সহ বিয়ের খরচ, পাত্র-পাত্রীর জন্মপত্র বা ঠিকুজি মেলানো ইত্যাদি। এসব খুঁটিনাটি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে অনেক সময় দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনা চলে, দর কষাকষিও হয়। যদি কখনও বড় রকমের জটিলতা বা বাধা দেখা দেয় তখন প্রবীণদের বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যস্থতা করতে ডাকা হয়। বিয়ের আগে দু'পক্ষের মধ্যে প্রায়ই নানা কারণে ছোটখাটো মতবিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। এবং বিয়ের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে মিটে গেলে দু'পক্ষই আশ্বস্ত হয়।

বিয়ের অর্থনীতির দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু আদিবাসী সমাজের রীতি হল, কনের বাবা-মাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কন্যাপণ দিতে হয়। এটা টাকায় বা জিনিসে অথবা দুয়ে মিলিয়েও দেওয়া যেতে পারে। বিহারের ছোটনাগপুরে ওরাওঁ-রা কনে ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য উপহার হিসাবে জামাকাপড় নিয়ে থাকে। পাশাপাশি, হো এবং মুণ্ডা সমাজে মেয়ের পরিবারকে কন্যাপণ হিসাবে এক বা একাধিক গোরু দেওয়ার নিয়ম আছে। অরুণাচল প্রদেশে এই উপহার হিসাবে 'মিথুন' (একধরণের প্রায় গৃহপালিত প্রাণী) দেওয়ার রীতি। আও নাগা সমাজে ঝুড়ি ভর্তি ধান ও একটি আও-ছোরা দেওয়া হয়। এদেশের গ্রামীন আদিবাসী সমাজে মেয়েদের অবস্থা নিরূপণের জন্য গঠিত কমিটির তরফে বিশেষ সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, 40 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত হারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের জন্য কন্যাপণ দেওয়া হয়। ওই সমীক্ষায় এটাও ধরা পড়ে যে, সমাজে কন্যাপণের হার ক্রমশই বাড়ছে। তামিলনাড়ুর ইরুলা সম্প্রদায়ের আগে কন্যাপণ হিসাবে চার আনা খরচ করত। এখন তারা 40 টাকা দেয়। ওড়িশার বিনঝল-রা আগে খরচ করত 60 থেকে 100 টাকা। এখন করে 400 টাকা। রাজস্থানের ভীল-রা আগে খরচ করত 60-100 টাকা, এখন তা বেড়ে হয়েছে 300-1000 টাকা। আদিবাসী সমাজের বাইরে কয়েকটি নিচু জাতের মধ্যেও এই কন্যাপণ দেওয়ার রীতি দেখা যায়। অন্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়কেই এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের উপহার দেওয়ার রীতি আছে। হিন্দু সমাজে বর বিশেষ গুরুত্ব পায়। হিন্দু বিয়ের

অনুষ্ঠানের একটি আবশ্যিক অঙ্গই হল—কন্যাদান। কনের বাবা-মার তরফে এই কন্যাদান করা হয়। এবং দান করলে সঙ্গে দক্ষিণা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে আরও কিছু 'দান' করতেই হয়। সনাতন প্রথা অনুযায়ী 'বরদক্ষিণা'র নামে যা হয়, তা নিতান্তই প্রতীকি ব্যাপার। ধনী, জমিজমার মালিক যে সব জাত, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি ও কাম্মা সম্প্রদায়, বা তামিলনাড়ুর পামগেরি ও আম্বাল্লাক্কারের গোষ্ঠীর লোকেরা বিয়েতে মেয়ের সঙ্গে নগদ টাকা, অলঙ্কার ও জমি দিয়ে থাকে। নগদ টাকা দেওয়া হয় বর বা তার বাবাকে। কনে অলঙ্কার পায়। এবং দান করা জমি কনের নামেই রেজিস্ট্রি করা হয়। কিন্তু এসবই ব্যতিক্রমী নজির। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই দান বা যৌতুকের পরিমাণ অনেক কম। স্বাধীনতার পর এই যৌতুকের পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে চলেছে। এখন আর তা স্বেচ্ছায় দান করার মধ্যে সীমিত নেই। বিয়ের সময় বরপক্ষ মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করে ও দরকষাকষি করে আদায় করে ছাড়ে। নব্যধনী সম্প্রদায় এই সমস্যাটা আরও বাড়িয়ে তুলেছে বিরাট পরিমাণে যৌতুক ও জমকালো সব বিয়ের ভোজ দিয়ে দিয়ে। আই এ এস বা অন্যান্য সরকারি উঁচু পদে কর্মরত ছেলেরা এখন বিয়েতে মোটা যৌতুক আশা করে ও পেয়েও থাকে। সমাজের অন্য অংশও এব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজেও পণপ্রথা প্রচলিত। বিয়ের পরেও চাপ দিয়ে পণ বা যৌতুক আদায় চলে। সমসাময়িক ভারতীয় সংবাদপত্রে নিয়মিত বধূহত্যা, পণের জন্য বধূকে পুড়িয়ে বা অন্যভাবে খুন করার খবর থাকে। অতীতে যা একসময় মেয়েকে বিয়ের পরে নিরাপত্তা দিতে চালু হয়েছিল, আজ তাই মেয়েদের মারণকাঠিতে পরিণত হয়েছে।

সনাতন হিন্দুধর্মে ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত নয়। কিন্তু অনেক জাতেরই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত। যে সব জাতের মধ্যে এর স্বীকৃতি আছে, তাদের অধিকাংশই দ্বিজ মর্যাদার অধিকারী নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকলেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। জাত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এটা হতে পারে। এধরণের বিবাহ বিচ্ছেদকে 'ছোড়-ছুট্টি' বা 'ছুট্টম-ছুট্টা' বলা হয়। যার অর্থ, 'ছেড়ে দিয়ে দুজনেই মুক্ত হয়ে যাও'। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের সমাজে একতরফা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যবস্থাও আছে। মনিপুরে খানিয়াবা রীতি অনুযায়ী স্বামী ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে পারে। এজন্য তাকে কোনও কারণ পর্যন্ত দেখাতে হবে না। খান্দেশ-এর গুজরাটি রাজপুত সম্প্রদায়ের পাখাইস সমাজে স্ত্রীরা স্বামী পরিত্যক্তা হলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী গোরখপুরের বৈশ্যদের মধ্যেও এই নিয়ম দেখা যায়। গোটা ভারতেই গ্রামসমাজের চিরাচরিত জাত পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে বিবাহ বিচ্ছেদ পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এই ব্যবস্থার চল রয়েছে। 1968 সালে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে এধরণের বিবাহবিচ্ছেদকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে।

1955 সালের হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদও স্বীকৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বা কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হতে পারে তাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে। দম্পতির কোনও একজন ব্যভিচার করলে, ধর্মান্তরিত হলে, মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটলে, দুরারোগ্য বা নিরাময়-অযোগ্য কুষ্ঠ রোগ হলে, যৌন রোগ হলে বা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলে অন্যজন আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে পারে। একই ভাবে স্বামী বা স্ত্রীর কেউ সাত বছর নিরুদ্দেশ থাকলে, আদালতের নির্দেশে আলাদা থাকাকালীন দু'বছরের মধ্যে আবার সহবাস শুরু না হলে এবং দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালত মঞ্জুর করে থাকে। ধর্ষণ, সমকামিতা বা পাশবিক কাজের জন্য স্বামী দণ্ডিত হলেও স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে পারে। মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্বামীকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া আছে। শুধু তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' উচ্চারণ করলেই হল। মুসলমান স্ত্রীর হাতে এরকম কোনও অধিকার নেই। মুসলমান স্ত্রী অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আইন অনুমোদিত তিনটি পথের আশ্রয় নিতে পারে, সেগুলি হল—তালাক তফবিদ, খুদ ও মুব্বারত। তালাক তফবিদ—যেখানে স্বামী নিজেই তাঁকে ডিভোর্স করার জন্য স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছে। খুদ—যেখানে স্ত্রী কোনও কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিবাহমুক্ত করে নেয় এবং মুব্বারত—যেখানে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। মুসলিম বিবাহ বিলোপ আইনে (1939) মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদ চাওয়ার নয়টি ক্ষেত্র বা কারণের উল্লেখ রয়েছে। তারমধ্যে অন্যান্য কারণের সঙ্গে টানা দু' বছর খোরপোশ না দেওয়া, এবং টানা তিন বছর সহবাস না করা এবং নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হলে 18 বছর বয়স বয়স হওয়ার আগে ওই বিয়েকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের আইনী অনুমোদন রয়েছে। একইভাবে নিষ্ঠুরতার অভিযোগেও মুসলিম স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারে। এ দেশের খ্রীষ্টানরা ইণ্ডিয়ান ডিভোর্স অ্যাক্ট (1869) অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে স্বামী অন্য ধর্মগ্রহণ করলে ও আবার বিয়ে করলে স্ত্রী ডিভোর্স চাইতে পারে। এছাড়া স্বামী ব্যভিচারী হলে (নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্ক বা অগম্যাগমন করলেও) একাধিক বিবাহ করলে, অথবা নিষ্ঠুর আচরণ করলেও স্ত্রী ডিভোর্স চাইতে পারে। হিন্দুদের মতোই খ্রীষ্টান আইনেও ধর্ষণ, সমকামিতা ও পাশবিকতার জন্য স্বামী দণ্ডিত হলে স্ত্রী ডিভোর্স পেতে পারে। ভারতীয় সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদকে একটা কলঙ্ক বলে মনে করা হয়। সমাজে মহিলাদেরই এজন্য কলঙ্ক বহন করতে হয়। বিশেষ করে হিন্দু উচ্চবর্ণ সমাজের মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুতর কলঙ্ক বলে ধরা হয়। তবে কলঙ্কের ভয় থাকলেও বিবাহ-বিচ্ছেদের সামাজিক স্বীকৃতি মেয়েদের কয়েকটি নিষ্ঠুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

স্ত্রীর খোরপোশ পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোটামুটিভাবে দুটি উৎস থেকে। প্রথমত, প্রত্যিটি সমাজের ব্যক্তিগত আইনের এ ব্যাপার কিছু ব্যবস্থা

বা বিধান দেওয়া আছে। এছাড়া আছে ভারতীয় দণ্ডবিধি যা প্রথম 1898 সালে তৈরি হয়েছিল, পরে 1974 সালে পরিবর্তিত আকারে এসেছে। ধর্ম ও ব্যক্তিগত আইন নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের ক্ষেত্রেই ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রযোজ্য। আগেকার আইনে স্ত্রী বা সন্তানকে ভরণপোষণ করতে অস্বীকার বা অবহেলা করলে তারা স্বামী বা বাবার (সন্তানের ক্ষেত্রে) বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিকার চাইতে যেতে পারত। নতুন আইনে অন্নসংস্থানহীন বাবা-মা এবং ডিভোর্স হওয়া স্ত্রীও এই দাবি নিয়ে আদালতে যাওয়ার অধিকারী। তবে ডিভোর্স হওয়া স্ত্রী যদি ব্যক্তিগত আইন বা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পেয়ে থাকে, তাহলে আদালতে নতুন আইনের আওতায় কোনও দাবি করতে পারবে না। এই আইন অনুযায়ী স্ত্রী-সহ পরিবারের যারা পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল তাদের ভরণপোষণের দায় পুরুষকেই নিতে হয়। তবে স্ত্রী খোরপোশ বাবদ কতটা অর্থ পাবে, তা স্বামীর উপার্জনের উপর নির্ভর করে। 1956 সালের হিন্দু আইন ও হিন্দু দত্তকগ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন অনুযায়ী স্ত্রীকে ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় খোরপোষ পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই হিন্দু আইনের আওতায় স্ত্রীর খোরপোষের দাবি তখনই গ্রাহ্য হবে, যদি পরপুরুষের সঙ্গে তার কখনই কোনও সম্পর্ক না থাকে। নতুন ভারতীয় দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে স্ত্রীর দাবি গ্রাহ্য হতে হলে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সময় তাকে পরপুরুষের সম্পর্ক বা ব্যভিচার এড়িয়ে চলতে হবে। অতীতে এধরনের কোনও ঘটনা ঘটলে তার জন্য স্ত্রীর দাবি অগ্রাহ্য হবে না। মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্ত্রী তিন মাসের জন্য স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী—এটাকে 'ইদ্দত' বলে। এছাড়া সে স্ত্রীধন বা 'মেহর' পাওয়ারও অধিকারী। তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির 125 ধারা অনুযায়ী মুসলমান নারী আদালতে খোরপোষ চেয়ে আবেদন করতে পারে। 65 বছরের বৃদ্ধা শাহবানুকে তাঁর আইনজীবী স্বামী আলাদা করে দিয়েছিলেন এবং পরে ডিভোর্স করেন। শাহবানু তখন ওই আইনের আওতায় আদালতের কাছে খোরপোষের দাবিতে মামলা করেন। এর আগেও মুসলমান নারীরা এই আইনের আওতায় মামলা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। শাহবানুও নিম্ন আদালতে মামলা জেতেন এবং সব শেষে সুপ্রিম কোর্টও তাঁর দাবির স্বীকৃতি দেয়। সুপ্রিম কোর্ট ওই মামলার রায়ে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা ব্যক্তিগত আইনের কড়া সমালোচনা করে একটি অভিন্ন সিভিল কোড তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গায় ঘা দেয় এবং এনিয়ে দেশে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার গোড়ায় সুপ্রিম কোর্টের এই 'প্রগতিশীল' রায়কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হলেও পরে ডিগবাজি খেয়ে দেশের আইন সংশোধন করে নেয়, যাতে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ হয়। যেহেতু শাহবানু মামলাকে কেন্দ্র করে

বিতর্কের শুরু, তাই তখনকার মতো শাহবানুও প্রচারের আলোয় এসে বিখ্যাত হয়ে যায়। তবে তা ছিল নেহাৎই তাৎক্ষণিক। উত্তেজনাপূর্ণ, আবেগময় এই বিতর্ক সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যার দিকে সবাইকে তাকাতে বাধ্য করেছিল। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা গেল, স্পর্শকাতর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। খ্রীষ্টানদের জন্য তৈরি ইণ্ডিয়ান ডিভোর্স অ্যাক্ট (1869) এবং পার্শিদের জন্য তৈরি পার্শি ম্যারেজ অ্যাণ্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট (1936)-এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। উভয় আইনেই স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা সুরক্ষিত। উভয় আইনেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলাকালীন স্ত্রী খোরপোষ বাবদ স্বামীর আয়ের এক-পঞ্চমাংশ অর্থ পেতে পারে। স্ত্রী পাকাপাকিভাবে কতটা খোরপোষ পাবে, তা নির্ভর করে স্বামীর টাকা দেওয়ার ক্ষমতা, স্ত্রীর নিজের সম্পত্তি এবং দুজনেরই চরিত্রের উপর। স্ত্রী যতদিন না আবার বিয়ে করছে বা পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে, ততদিন পর্যন্ত এই খোরপোষ পেয়ে যাবে।

বর্তমান আইনে সব সম্প্রদায়ের বিধবা বা ডিভোর্স হওয়া নারী পুনর্বিবাহ করতে পারে। যদিও সনাতন ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী হিন্দু সমাজের দ্বিজ-জাতির নারীদের দ্বিতীয়বার বিবাহ অনুমোদিত হয় না। হিন্দু পুরুষ ইচ্ছা করলে ঢাকঢোল বাজিয়ে যতবার খুশি বিয়ে করতে পারে, কিন্তু হিন্দু নারী কেবল একবারই বিয়ে করতে পারে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি যথেষ্ট জটিল। এই জটিলতার জাল ভেদ করতে হলে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন নিয়মাদি, নানা ধর্মীয় বিধান, আধুনিক আইন ও প্রচলিত প্রথা—সবই ভাল করে বুঝতে হবে। সমাজের নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরাধ ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য আইনে অভিন্ন দণ্ডবিধি বা সবার জন্য একই আইন বলবৎ হলেও পরিবারের নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইনকেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তিগত আইনও ধর্ম এবং অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন আকার নিয়েছে। হিন্দুদের (বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদের ক্ষেত্রেও) উত্তরাধিকারের বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য তিনটি আলাদা ধারার আইন-রীতি প্রচলিত। দেশের উত্তর, মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে চলে মিতাক্ষর আইন। পূর্বভারতের বাংলা, বিহার, ওড়িশা, প্রভৃতি এলাকায় চলে 'দায়ভাগ' আইন। দাক্ষিণাত্যের মাতৃকুলভিত্তিক সমাজে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধির নাম—মারুমাক্কাতায়াম আইন (Marumakkattayam Law)। মিতাক্ষর আইনে পরিবারে ছেলে জন্মসূত্রেই যৌথ পরিবারের সম্পত্তির অধিকারী। আইনের পরিভাষায়, সে পৈত্রিক সম্পত্তির হিস্যাদার বা সমভাগী। দায়ভাগ আইনে, জন্মসূত্রে যৌথ পরিবারের সম্পত্তির হিস্যাদার হওয়ার অধিকার দেওয়া নেই। দুই ব্যবস্থাতেই সম্পত্তিতে মেয়েদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় নি। যেটুকু দেওয়া হয়েছে, তা শুধু জীবিতকালে সম্পত্তি ভোগের অধিকার। মারুমাক্কাতায়াম আইনে বংশ পরম্পরায়

মাতৃকুলের সন্তানরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। তবে কন্যাদের মতোই পুত্রসন্তানও সম্পত্তির অংশ পাবে। আদিবাসী সমাজে তাদের সনাতন প্রথাই চলে আসছে।

1956 সালে তীব্র বাধার মুখে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাস হয়। তাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই আইন পাস হওয়ায় মিতাক্ষর ও দায়ভাগ রীতির অবসানের সঙ্গেই যে সব গোষ্ঠীতে মারুমাক্কাতায়াম আইন প্রচলিত, সেখানেও নতুন আইনের হাত প্রসারিত হল। মাতৃকুলপ্রধান সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই সব সমাজে উত্তরাধিকার বিধিতে কিছুটা পার্থক্য রাখার ব্যবস্থাও করা হল। তবে নতুন আইনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক দিক হল, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলেদের মতোই মেয়েদেরও পূর্ণ স্বীকৃতি। কোনও ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তার বিধবা স্ত্রী, মা, পুত্র-কন্যা, সবারই সমান অধিকার স্বীকৃত হল। এমনকি বিধবা পুত্রবধূ ও মৃতপুত্রের পুত্র-কন্যারাও ওই সম্পত্তির সমান অংশীদার। বর্তমান আইনে মেয়েরা আর আগের মতো শুধু জীবনস্বত্ব ভোগ করে না, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পূর্ণ অধিকারী। এভাবে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে যে সুসমঞ্জস ব্যবস্থা তৈরি হবে ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে তা কিন্তু হয়নি। তার কারণ, নতুন আইনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি আপস রফা করা হয়েছিল। যেমন, মিতাক্ষর রীতির যৌথপরিবারের উত্তরাধিকার প্রথা এখানেও বজায় রাখা হল। যার মধ্যে মেয়েদের জন্মসূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদার হওয়ার সুযোগ নেই। এখনকার নিয়মে সম্পত্তির হকদার কেউ আচমকা মারা গেলে সম্পত্তিতে তার অংশটুকু আলাদা করে নেওয়া হয়, যেন তাকে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে ওই সম্পত্তি, তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার, রাজ্যগুলির ভূমিসংক্রান্ত জমিস্বত্বের উত্তরাধিকার থেকে মেয়েদের বাদ রাখা হয়েছে। মুসলমান সমাজে শরিয়ত অনুযায়ী মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়, তবে ছেলেদের তুলনায় পরিমাণে অর্ধেক। খ্রীষ্টান সমাজে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের উত্তরাধিকার-রীতি প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতের খ্রীষ্টান সমাজে মেয়েরা বাবার সম্পত্তির পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অথবা পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যেটা কম হবে, সেটাই পেতে পারে। সমাজে পারিবারিক আইন অবশ্য জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। কিন্তু আইনের পথে প্রতিকার পাওয়া সহজ নয় এবং তা ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই এব্যাপারে মেয়েরা বেশ কিছুটা অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়ে গিয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় সমাজে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধের প্রাচীর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। অঞ্চল, ধর্ম, গোষ্ঠী ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মনোমত জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে সমাজ আর আগের মতো বাধা দেয় না। কিন্তু একইসঙ্গে বিয়ের জাঁকজমক ব্যয়বহুল অনুসঙ্গ এখন জোরাল হয় উঠেছে এবং পণপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

আত্মীয়তা

রক্তের সম্বন্ধে, বা বিয়ের সূত্রে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা যে সম্পর্ক, তাকেই আত্মীয়তা বলা হয়। রক্তের সম্পর্কের আর একটি সংজ্ঞা জ্ঞাতিত্ব। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় বিয়েয় সংজ্ঞা সগোত্রতা। প্রতিটি সমাজেই 'আত্মীয় স্বজন' একটা 'শ্রেণী' হিসাবে আলাদা মর্যাদার অধিকারী। আগেই বলা হয়েছে, আত্মীয়দের মধ্যকার আচারব্যবহারের বিস্তারিত নিয়মবিধি সুনির্দিষ্ট। এই আচারবিধির মাধ্যমে আত্মীয় সম্পর্কের মানুষরা পরস্পরকে নিরাপত্তা দেয়, আদরযত্ন করে, সম্পর্কের নৈকট্য অনুযায়ী ঠাট্টাতামাসা করে, আবার সম্পর্কের দূরত্ব অনুযায়ী ছোঁয়াছুঁয়ি এমনকি কথাবলা ও দৃষ্টিবিনিময়ও বাঁচিয়ে চলে, বড়দের সম্মান জানায়।) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক শিল্পসভ্যতা কেন্দ্রিক সমাজে আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্ব গৌণ হয়ে পড়েছে, এই দাবি বড়জোর আংশিকভাবে সত্য। এখন আর আগের মতো আত্মীয়তার বন্ধন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ঠিকই, কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মীয়তার জেরে এখনও বহুসময়ই বিভিন্ন ঘটনাকে প্রভাবিত করে থাকে।

পরিবার প্রসঙ্গে বংশানুক্রম, নিবাস ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আলোচনা হয়েছে। এনিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা ক্লান্তিকর এবং অনেকটাই তাত্ত্বিক কচকচিতে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু আত্মীয়তা সম্পর্কের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে উল্লেখ করা দরকার। একইসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ উদাহরণের কথাও সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

উত্তর ভারতে পিতৃকুলের ধারার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের গোষ্ঠীকেই মূল আত্মীয় সম্পর্কে যুক্ত বলে ধরা হয়। কুল-বংশ, গোত্র ও জাতিসাধারণ মানুষ কুল ও বংশের সূক্ষ্ম প্রভেদ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। জাতি বলতে এখানে জাত-ভাই অর্থে ব্যবহৃত। কুল ও বংশের ক্ষেত্রে গোত্রান্তর বিবাহ সিদ্ধ। কিন্তু জাত বা জাতির ক্ষেত্রে তা অসিদ্ধ। বাবা, মা, বাবার-মা বা মায়ের মা-র গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বংশ পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা ও সম্পত্তি পুত্রসন্তানের পরম্পরায় বর্তায়। আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ মানুষরা আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কাজকর্মেও একে অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার একই সঙ্গে বংশানুক্রমে পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘর্ষের জেরও তারা বহন করে চলে। কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আত্মীয়দের নিজেদের মধ্যে উপহার বিনিময়ের প্রথা আছে। কিন্তু অঞ্চলভেদে, বা জাতভেদে এই নিয়মের এত অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে যে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয় বৈশিষ্ট্য হল, নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোনও কোনও সমাজে গ্রাম বা এলাকার বাইরে বিবাহ-রীতির সুবাদে বর ও কনের মধ্যে আরও অপরিচয়ের

দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা হয়। পরিবারে 'কন্যা' ও পুত্রবধূ'র ভূমিকাও আলাদা করে নির্দিষ্ট।

দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া আত্মীয়বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একইরকম। সেখানে, কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে পিতৃকুলনির্ভর পরিবার ও আত্মীয়সম্পর্ক গড়ে উঠলেও মাতৃকুলনির্ভর পরিবাররীতিই প্রবল। মাতৃকুলনির্ভর পরিবারে বাবার বদলে মামাই কর্তার ভূমিকা নিয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, কয়েকটি গোষ্ঠীর সমাজে কয়েক ধরনের নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিবাহকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। যেমন মামা-ভাগ্নির বিবাহ (যেখানে দিদির মেয়ের সঙ্গে বিবাহই সবচেয়ে রাজযোটক ধরা হয়), ভাই-বোনের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি। এধরনের বিবাহে যে পরিবারে বিয়ে হচ্ছে, মেয়েরা তার সদস্যদের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত থাকে। ফলে, উত্তর ভারতে যেমন বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের উঁচু-নিচু ভেদ করা হয়, দক্ষিণে তা অনুপস্থিত। দক্ষিণ ভারতের এ ধরনের বিবাহের অন্য সুবিধাটি হল, নিজেদের মধ্যেই বিয়ে হওয়ায় পারিবারিক সম্পত্তি পরিবারের হাতছাড়া হয় না। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বিয়ে হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের উপর নির্যাতন হওয়ার সম্ভাবনাও অনেকটাই কমে যায়। বিপরীতে, উত্তরভারতে মেয়েরা বিয়ের পর অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে এসবের মধ্যেই পড়ে।

সব শেষে, এমন কয়েকটি বিশেষ নজিরের দিকে তাকানো যাক, যা বহিরাগতদের প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মেঘালয়ের খাসি উপজাতি মাতৃকুলের ধারা মেনে চলে। খাসি সমাজে বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর ঘরে যায় না স্বামীই স্ত্রীর বাড়িতে এসে বাস করে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পরিবারের কনিষ্ঠতম কন্যার (khudduh) মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। সেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বিয়ের পরে একটি-দুটি সন্তান হলে অন্য মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে সংসার পাতে। কিন্তু ছোট মেয়ে স্বামী-পুত্রসহ মায়ের সঙ্গেই থেকে যায়। পরিবারের যাবতীয় আচার-সংস্কার রক্ষার দায়িত্ব ও বাড়ির দায়িত্ব ছোট মেয়ের উপরেই বর্তায়। পারিবারিক জমির ক্ষেত্রেও ছোট মেয়ের ভূমিকা মুখ্য এবং তার স্বামী বাড়ি তৈরি করে সেখানে কর্তা হয়ে বসতে পারে।

গারো সমাজে পরিবারবর্গকে বলা হয় 'নোক' (Nok)। পারিবারিক ধারা বজায় রাখার দায়িত্ব যে মেয়ে পায়, তাকে বলা হয় 'নোকমা'। তাকে তার পিতৃকুলের কাউকে বিয়ে করতে হয়, এবং তার স্বামীকে বলে নোকরম (Nokrom)। সে মেয়ের বাবার মৃত্যুর পরে পরিবারের কর্তার ভূমিকায় পারিবারিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু ওই দায়িত্ব নেওয়ার আগে তাকে নিয়ম মেনে স্ত্রীর মাকে বিয়ে করতে হয়। সাধারণত, এটা একটা আর্থিক বোঝাপড়া মাত্র। ওই বিয়ের সুবাদে তাদের মধ্যে আদৌ যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিনা সন্দেহ। তবে কোনও কোনও

নৃতত্ত্ববিদ জোর দিয়ে দাবি করেন যে, এধরণের বিবাহেও যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠার নজির রয়েছে।

বিয়ের পরেও স্বামী-স্ত্রীর নিজের নিজের বাড়িতে থেকে যাওয়ায়, এবং স্ত্রীর বাড়িতে মাঝে মাঝে স্বামীর রাতকাটানোর যে রীতি অতীতে মধ্য কেরলে এবং এখনও লাক্ষাদ্বীপে দেখা যায়, তা বহিরাগতদের কাছে যথেষ্ট অদ্ভুত মনে হতেই পারে। কিন্তু অতীতে এই ব্যবস্থায় কাজ দিয়েছে, এখনও কাজ দিচ্ছে। নায়ার সম্প্রদায়ের মেয়েরা নাম্বুদিরি বা নায়ারদের মধ্য থেকে তাদের জন্য অভিসারী-স্বামী (Visiting husband) গ্রহণ করতে পারে। দূরত্ব বেশি হওয়ার জন্য অনেক নায়ার স্বামীই তার স্ত্রীর কাছে প্রতি রাত্রে যেতে পারে না। কিন্তু নাম্বুদিরি-স্বামীরা বিশেষ সুবিধাভোগী। যেখানে জমির আকাল নেই, সে সব জায়গায় নায়ার 'তারাওয়াড'-এর কাছেই নাম্বুদিরি-স্বামীর জন্য আলাদা একটি থাকার জায়গা 'মাথামা' তৈরি করা হয়। সাধারণত এই থাকার জায়গা তৈরি হয় পুকুর বা কুয়োর কাছে। নাম্বুদিরি-স্বামী তার নায়ার-স্ত্রীর বাড়িতে খেতে পারে না। এবং দিনের বেলায় নিজের শুচিতা বজায় রাখতে সে তার নায়ার-স্ত্রী জাত ছেলেমেয়ে বা স্ত্রীর সম্পর্কদোষও বাঁচিয়ে চলে। রাতে অবশ্য সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই এধরণের পারিবারিক ব্যবস্থা এখনও দেখা যায়। লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের কালপেনি দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে 76 শতাংশ পরিবারেই এই রীতি প্রচলিত। ছোট দ্বীপ হওয়ার সুবাদে যাতায়াতের দূরত্ব কম হওয়ায় এই নৈশ অভিসারের দাম্পত্যব্যবস্থা এখনও ভালভাবেই অটুট রয়েছে।

পাঁচ

গ্রাম ও নগরের পটভূমি

সমাজকাঠামোর প্রধান উপাদানগুলি, অর্থাৎ জাতি, গোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় এমনকি পরিবার ও আত্মীয়বর্গ—এসবই আলাদা আলাদা থেকে কাজ করতে পারে না। গ্রাম হল এমনই একটি জায়গা, যে মঞ্চে সামাজিক সমন্বয় ও একই সঙ্গে সম্পর্কের প্রক্রিয়া চলে। সংঘর্ষের নিরসন ও সামাজিক শক্তি সুসংহত করার কাজ গ্রাম তার ঐতিহ্য পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসা নিজস্ব ব্যবস্থাবলেই করে থাকে। বিপরীতে, বহু গ্রাম আছে যেখানে পরম্পরায় গোষ্ঠী বিবাদ চলে আসছে। বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রাম-কে একটি একক (ইউনিট) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে এখন গ্রামে একাধিক স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা এখন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় গ্রামে রাজনৈতিক দলগুলি অফিস পর্যন্ত খুলে বসেছে। গ্রাম কোনও সমবায় গোষ্ঠী বা সংস্থা নয়, তবে তার একটা নিজস্ব পরিচয় আছে। তার নির্দিষ্ট সীমানা (জমি ও বনাঞ্চল), গোচারণ ক্ষেত্র এবং পুকুর ও কুয়ো-র মতো যৌথ সম্পত্তি আছে। এছাড়াও গ্রামে মন্দির মসজিদ, গির্জা বা গুরুদ্বার থাকতে পারে। এবং তা নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য বা সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে।

ভারতীয় গ্রাম এক একটি 'স্ব-নির্ভর ছোট প্রজাতন্ত্র', বহুল প্রচারিত এই মত কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। অতীতেও ভারতীয় গ্রামকে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে বাইরের জগতের উপর নির্ভর করতে হত। যেমন, খাদ্যের আবশ্যিক অঙ্গ লবণ। যাযাবর বেদেরা গ্রামে গ্রামে এই লবণ সরবরাহ করত। দক্ষিণ ভারতে এই বেদেরা 'লাম্বাদ' নামে পরিচিত। স্বামী বর্তমানে স্ত্রীর আবশ্যিক ভূষণ যে চুড়ি, তাও সব গ্রামে তৈরি হত না। আরও অনেক জিনিসের জন্য এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। বাজারহাটে একাধিক গ্রাম থেকে ক্রেতা আসত। সাপ্তাহিক হাটের স্থান নির্বাচন হত বেছে বেছে এমন গ্রামে, যেখানে কাছাকাছি অন্য গ্রাম থেকে সহজেই লোকজন আসতে পারে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বড় বড় মেলায় দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসার কথা অনেক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ও পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া যায়। অনেকে আবার দূর দেশে তীর্থ পর্যটনে যেত। কাছের বা দূরের গ্রাম থেকে বিয়ে হওয়া মেয়েরা আসত। আত্মীয়তার সূত্রে

সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আন্তঃগ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল।

গ্রামভারতই প্রধান পরিচয় হলেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে নগর ঐতিহ্য রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল। বিদেশী পর্যটকরাও এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু সমৃদ্ধ নগরের উল্লেখ করে গেছে। এই সব নগরের কিছু ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র, কিছু ছিল ধর্মীয় তীর্থস্থান এবং বাকি নগরগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র। এইসব নগর ও তার চারপাশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আদান প্রদানের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। এখন যোগাযোগ আরও বেড়েছে। সরকারি কাজে, মামলা মোকদ্দমার জন্য, উন্নয়ন ও বিকাশের কাজে বা অন্য অনেক প্রয়োজনে গ্রামের মানুষকে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি বেশি করে শহরে যাতায়াত করতে হয়।

প্রতিটি গ্রামেই জাতপাতের ভাগাভাগি বর্তমান। এই জাতগোষ্ঠীরা অন্যান্তরেও নিজেদের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। তবে জাত-সম্পর্ক ছাড়াও গ্রামে প্রতিবেশীদের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের গাঁটছড়া বাঁধা আছে। সেইসঙ্গেই রয়েছে কলহদ্বন্দ্বের সম্পর্কও। গ্রামে জাতপাতের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা দরকার,—আলাদা আলাদা জাতের মানুষের আলাদা আলাদা জাত-পেশার সুবাদে তারা একে অপরের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। গ্রামে জাত-পঞ্চায়েত ছাড়াও গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বর্তমান, যেখানে সব জাতের প্রতিনিধিরাই অংশ নেয়। এছাড়া রয়েছে গ্রামের গোষ্ঠী বিবাদ। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে এখন গ্রামের চেহারা অনেকটাই বদলে গিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, অধিকাংশ জাতেরই নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট পেশা রয়েছে। জাত-পেশা ছাড়া আরও কিছু পেশা বা বৃত্তি আছে, যা সবারই জন্য। জাত-নির্বিশেষে। গ্রামের যে কোনও মানুষ ওই সব পেশা গ্রহণ করতে পারে। অনেক চিরাচরিত পেশাই পরিবারকে কেন্দ্র করে পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসছে। বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রে কাজের বিনিময়ে টাকা পয়সা অথবা জিনিস এবং কখনও দুটোই দেওয়ার প্রথা আছে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই প্রথা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তবে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে 'যজমানী' বলে। এই নামকরণের হেতু কারণ আর কিছুই নয়, শুধু প্রথম যখন উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামের নজির দিয়ে এই প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়, তখন একে 'যজমানি' প্রথা বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই প্রথাকে 'গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক' সম্পর্কও বলা হয়। কিন্তু এই আখ্যা বিভ্রান্তিকর। ধনী ভূস্বামী (পৃষ্ঠপোষক) ও কামার-ছুতোর প্রভৃতি জাত-পেশার মানুষের (গ্রাহক) মধ্যেকার সম্পর্ককে এ ভাবে দেখা যায় ঠিকই। কিন্তু একই আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যেও এধরণের বিনিময় প্রথা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে, কে পৃষ্ঠপোষক, কে গ্রাহক তা নির্ণয় করা কঠিন।

কী ভাবে এই ব্যবস্থা চলে, তা কয়েকটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। তবে, গোটা দেশে এই প্রথার চেহারা এক নয়। এবং প্রতিনিয়ত দেশের কোনও না কোনও প্রান্তে এই প্রথার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। মনে রাখতে হবে, আর্থিক কারণ ছাড়াও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এধরণের পেশাগত কাজের বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে। চাষের কাজে যাদের নিযুক্ত করা হয়, তাদের কাছ থেকে কী ধরণের কাজ প্রত্যাশিত এবং বিনিময়ে তারা কী পাবে তা পরিষ্কার জানা থাকে। নাপিতের জাত-পেশা ক্ষৌরকর্ম বা চুল কাটা। এজন্য চাষিরা ফসল উঠলে নাপিতকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল দেয়। চাষি ছাড়াও অন্য জাত-পেশার মানুষও নাপিতকে কাজে লাগাতে পারে। সেজন্য তারাও বিনিময়ে নাপিতের কিছু কাজ করে দেবে। যেমন, কুমোর নাপিতকে কিছু মাটির হাঁড়ি-কলসি দেবে। কামার নাপিতের ক্ষুর, নরুণ ইত্যাদি প্রয়োজনমত শান দিয়ে দেবে। ছুতোর নাপিতের কিছু কাঠের কাজ করে দেবে। এছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানেও নাপিতের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। উত্তর ভারতে গ্রামের মধ্যে ও চার পাশের এলাকায় বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে নাপিতকে পাঠানো হয়। নাপিত-বাড়ির বউ-ঝিরা বিয়ের ভোজের জন্য (শ্রাদ্ধের সময়ও) পাতার থালা-বাটি তৈরি করে দেয়। এছাড়া বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের পায়ে আলতা পরানোও তাদেরই কাজ। জাত-পেশার বিনিময়ে চাষি পরিবার থেকে বাৎসরিক ফসল পাওয়া ছাড়া উৎসব-অনুষ্ঠানে নাপিতরা নগদ টাকা ও খাওয়া পায়।

ছুতোর চাষিদের জন্য লাঙ্গল-হাল তৈরি করে দেয়, পুরনো লাঙ্গল মেরামত করে। কামারও লাঙ্গলের ফলা এবং চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করে দেয়। কুমোর তৈরি করে দেয় জল রাখার মাটির কলসি এবং ফসল রাখার বড় বড় জালা। চামার বা মুচি হালে জোতার বলদের জন্য প্রয়োজনীয় চামড়ার সাজ তৈরি করে। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য গ্রামের স্বর্ণকার সোনা বা রূপোর ছোটখাট অলঙ্কার তৈরি করে দেয়। বিয়ের আসরের জন্য সাজসজ্জার প্রয়োজনে ছাঁদনাতলার ব্যবস্থা করে দেয় ছুতোর। বিয়ের আসরের আবশ্যিক অঙ্গ হল কাঠের একটা খুঁটি, যেটা ছুতোর বসিয়ে দেয়। কামারের কাজ হল একটি বড় ও শক্তপোক্ত লোহার পেরেক যোগান দেওয়া, যা ওই খুঁটিতে ভালভাবে গাঁথা হয়—বিয়ের বন্ধন মজবুত করার প্রতীক হিসাবে। ব্রাহ্মণের দরকার পড়ে পাঁজিপুঁথি দেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কৃষিকার্য আরম্ভের শুভলগ্ন নির্ণয়ের জন্য। এর বিনিময়ে ব্রাহ্মণ পরিবার নিয়মিত মাসিক সিধা পায়। প্রধানত চাল, ময়দা, গুড়, হলুদ, কাঁচালঙ্কা, ঘি—এসবই থাকে 'সিধা'তে, যা ব্রাহ্মণ পরিবারের আহার্য তৈরির জন্য লাগে। সামাজিক পালা-পার্বণ পূজার্চনার জন্য ব্রাহ্মণকে আলাদা করে নগদে ও জিনিসে দক্ষিণা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন পেশার কারিগর ও কারুজীবীরাও নিজেদের প্রয়োজনে পারস্পরিক কাজের বিনিময় করে থাকে। সোনা বা রূপোর গহনায়

বাড়তি নকশা তোলার জন্য, গরুর গাড়ি বা আসবাবপত্র, জুতো, এমনকি সৌখিন চুলের ছাঁট-এর জন্য নগদে পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা আছে। এধরণের যজমানি প্রথা গ্রামে এখনও আছে, যদিও আগের মতো জোরালো নয়। নগদ ও জিনিসের বিনিময় প্রথা নিয়ে প্রায়শই অসন্তোষ বিবাদ বিসম্বাদ বাধতে দেখা দেয়। এখনকার দিনে অনেকেই আর বিনিময় প্রথায় যেতে চায় না। বরং তারা নগদ মূল্য দাবি করে থাকে। সেই সঙ্গে জাত-পেশা ছেড়ে অনেকেই অন্য পেশাও গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামে দু'ধরণের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে—জাত-পঞ্চায়েত ও গ্রাম-পঞ্চায়েত। কোনও গ্রামে একটি বিশেষ জাতের মানুষ সংখ্যায় নিতান্তই কম হলে, তারা পাশাপাশি গ্রামের জাত-পঞ্চায়েতের নিজেদের যুক্ত করে নেয়। গ্রাম-পঞ্চায়েতে প্রায় সব জাত-পঞ্চায়েতের মধ্যে মাথারা প্রতিনিধিত্ব করে। পঞ্চায়েতের প্রধান মুখিয়া বা সরপঞ্চ বংশানুক্রমে বা পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যদের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। জাত-পঞ্চায়েত সম্পত্তি ও পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ মেটায়। গ্রামে দুই বা তার বেশি জাতের মানুষের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তখন তা গ্রাম-পঞ্চায়েতের সামনে আসে। এছাড়া যদি কখনও এমন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়, যাতে গোটা গ্রামের মর্যাদা জড়িত, সেরকম ক্ষেত্রেও গ্রাম-পঞ্চায়েত বিচার করার ভার নেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে চিরাচরিত এই ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারি বিধিবদ্ধ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করা ও উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতির উপর নজর রাখার জন্যই এটা করা হয়েছে। কোনও কোনও রাজ্যে আবার কম ব্যয়ে ছোটখাটো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিধিবদ্ধ 'ন্যায়-পঞ্চায়েত' ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি বিধিবদ্ধ পঞ্চায়েতগুলি বড় বড় গ্রামে বসানো হয়েছে। একাধিক ছোট ছোট গ্রামকে একটি পঞ্চায়েতের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে, পুরনো ঐতিহ্যগত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এখন আর তেমন শক্তিশালী নয়। পুরনো ও নতুন (সরকারি) পঞ্চায়েতের মধ্যে সংঘাতের খবরও মাঝে মধ্যে শোনা যায়।

গ্রামজীবনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গোষ্ঠী বিবাদ সামাজিকভাবে অনুমোদিত নয়। কিন্তু গ্রামে ব্যক্তি, পরিবার প্রভৃতির শক্তিবিন্যাসের প্রতিফলন হিসাবেই গোষ্ঠীবিবাদ মাথাচাড়া দেয়। এই শক্তিবিন্যাস কখনও শত্রুতাকে কেন্দ্র করে, কদাচিৎ সহযোগিতাকে কেন্দ্র করে ঘটে। গোষ্ঠী বিবাদ তার নিজস্ব নিয়ম ও যুক্তি অনুযায়ী চলে। প্রতিটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এক বা একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, এবং সাধারণভাবে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। তবে কোনও একটি পরিবারের আত্মীয়স্বজনরা একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এরকম নজির পাওয়াও অসম্ভব নয়। জাতগুলির নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকলেও, এই সব গোষ্ঠী চক্রকে বিভিন্ন জাতের পরিবার ও ব্যক্তিই মদত জুগিয়ে থাকে। যে কোনও গ্রামেই এ

ধরনের দুই বা তিনটি বড় গোষ্ঠী থাকে, যাদের অস্তিত্ব বেশ কয়েক পুরুষ ধরে টিকে থাকে। আবার কোনও কোনও ছোটখাট সংঘাতকে কেন্দ্র করে স্বল্পমেয়াদী গোষ্ঠীর জন্মও হয়। বিবাদ নিষ্পত্তির সঙ্গেই এধরণের গোষ্ঠীর অস্তিত্বও লোপ পায়। বড় গোষ্ঠী চক্রগুলি তাদের অনুগতদের নিয়মিত সাহায্য করে থাকে। এই সাহায্যের মধ্যে পেশীশক্তি থেকে শুরু করে মামলায় আদালতে মিথ্যাসাক্ষী খাড়া করা—সবই পড়ে। সদস্যদের স্বার্থ এক হলে সংহতির জন্য গোষ্ঠী তৈরি হয়। এ ধরনের গোষ্ঠী পারিবারিক কোন্দল, নিজের জাতের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদ ও অন্য গ্রামের সঙ্গে বিবাদ মেটাতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এমন কি আগেকার পঞ্চায়েত ও এখনকার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজকর্মেও এধরণের সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে। এখন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নানা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের সুবাদে গ্রামের এই গোষ্ঠীগুলি আরও বড় ময়দানে খেলার সুযোগ পেতে শুরু করেছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামের প্রতি বৈষম্যের চেহারাটাও তুলে ধরা দরকার। 1970-71 সালের কৃষি-সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের 50.6 শতাংশ কৃষিজীবীর হাতে মাত্র 9 শতাংশ জমি আছে। 32.9 শতাংশ মানুষই আধ হেক্টরের কম জমির মালিক। আধ থেকে এক হেক্টর জমির মালিক 17.7 শতাংশ। এক থেকে দুই হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকের পরিমাণ 19 শতাংশ। অন্য দিকে, 3.5 শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে দেশের 30.9 শতাংশ জমি। 1975 সালের কৃষি-পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী 3 কোটি 57 লাখ মানুষ এক হেক্টরেরও কম জমির মালিক। এটা মোট জোতের 51 শতাংশ। এক থেকে দুই হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকের সংখ্যা এক কোটি 34 লাখ, যা মোট জোতের 19 শতাংশ। গ্রামের খুবই গরিব অংশের হাতে প্রায় কোনও জমিই নেই, বা যেটুকু আছে তাতেও অর্থকরী কোনও চাষ করা সম্ভব নয়। গ্রামের ছোট বা প্রান্তিক চাষীর হাতে সাধারণত সবচেয়ে খারাপ জমিগুলি রয়েছে। উর্বর ও সেচের সুবিধাযুক্ত জমি সবই ধনী চাষিদের দখলে।

বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে কয়েকটি জাতের মানুষ প্রধানত ভূস্বামী বা বড়জমির মালিক হিসাবে দেখা দিয়েছে। যেমন, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় জাঠ, পশ্চিম উত্তর প্রদেশে জাঠ ও রাজপুত, বিহারে ভূমিহার ও রাজপুত, গুজরাতে পতিদার, অন্ধ্রে রেড্ডি, ভেলাম্মা ও কাম্মা, এবং কর্ণাটকে ভোক্কালিগ ও লেঙ্গয়াতরা। অবশ্য এ সব জাতের ছোট একটা অংশই বড় ভূস্বামী হয়ে উঠেছে। এ সব জাতেরও অনেকেই এখনও সামান্য বা নামমাত্র জমির মালিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জাতের সম্মিলিত আর্থিক শক্তি থাকায় ধনী শ্রেণীর মানুষরা রাজনৈতিক দিক থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে গরিব ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের কাছে এরা শোষক ও অত্যাচারী হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনকি নিজের জাতের গরিব

মানুষকেও এরা রেহাই দেয় না। 1971 সালের কৃষি-সুমারি অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের 43 কোটি 88 লাখ মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যারা কাজ করে এবং যারা করে না। যারা কাজ করে তাদের সংখ্যা 14 কোটি 84 লাখ, অর্থাৎ 33.8 শতাংশ। যারা কাজ করে না, তাদের সংখ্যা 29 কোটি চার লাখ, অর্থাৎ 66.2 শতাংশ। কর্মীদের মধ্যে 51.95 শতাংশই কৃষিজীবী। 30.71 শতাংশ কৃষি শ্রমিক। এছাড়া পশুপালন, মাছচাষ ইত্যাদিতে 2.53 শতাংশ যুক্ত। খনির কাজে, নির্মাণ কার্যে, ঘর গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কাজে, ব্যবসায় ও পরিবহণ ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত 14.97 শতাংশ মানুষ। কৃষিকাজ ছেড়ে শিল্পে সরে আসার প্রবণতা অত্যন্ত কম। 1881 সালে 77.4 শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 90 বছর পরে 1971 সালের হিসাবে দেখা যায়, তখনও কৃষিকাজে যুক্ত রয়েছে 72.5 শতাংশ মানুষ। রাজ কৃষ্ণের হিসাবে 1973 সালে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 83 লাখে। আরও এক কোটি 73 লাখ মানুষ বছরের সামান্য সময় কাজ পেত। সমসাময়িক জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্টেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগের অভাবে বছরে 500 কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হচ্ছে, এছাড়া 40 লাখ মানুষের হাতে সারা বছর কোনও কাজ নেই। ভূমিসংস্কার থেকে সেরকম ফল পাওয়া যায় নি। দেশে ঘোষিত মোট উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ যেখানে 15.9 লাখ হেক্টর সে জায়গায় মাত্র 5.2 লাখ হেক্টর জমি বিলি করা হয়েছে 8 লাখ 70 হাজার ভূমিহীন মানুষের মধ্যে। ফলে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য ভালভাবেই রয়ে গিয়েছে। এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও জীবনযাত্রার মানের তারতম্যের মধ্য দিয়ে এই বৈষম্য ও দারিদ্র্যের চেহারা প্রতিফলিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের এই বিরাট সংখ্যক গরিব মানুষ প্রতিনিয়ত শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছে। সমাজ সংস্কারের বড় বড় বৈপ্লবিক বুলি সত্ত্বেও প্রকৃত সংস্কারের কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে।

গ্রামভারতের এই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামকে বোঝার চেষ্টা করা দরকার। যদি কোনও গ্রাম জাত-পেশার সুবাদে নিজের সবরকম চাহিদা মেটাতে অসমর্থ হয়, তাহলে সেই গ্রামের মানুষ প্রতিবেশী গ্রাম থেকে যজমানি প্রথায় নিজের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করে। আত্মীয়তার সুবাদেও এক গ্রামের মানুষের সম্পর্কের জাল দূরের গ্রাম এমনকি শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অনেক এলাকাতেই একাধিক গ্রামের মধ্যে জাত-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, পঞ্জাবে 'মিসল', পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশে 'খাপ' এবং উত্তর-মধ্যপ্রদেশের 'কুন্দারিয়া'। জাত সংক্রান্ত গুরুতর বিবাদ সমস্যা মেটাতে মানুষ এধরণের পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়। তবে এধরণের জাত পঞ্চায়েতের প্রভাব এখন ছোট ছোট এলাকার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছে এবং অনেক জায়গাতেই এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। জাত-পঞ্চায়েত ছাড়াও গ্রাম-পঞ্চায়েত

এবং আন্তঃগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। তবে এখন তা অনেকটাই নিয়মরক্ষায় এসে পৌঁছেছে এবং কদাচিৎ এধরণেব পঞ্চায়েতের বৈঠক বসে।

গ্রামীণ ও নাগরিক মানসিকতার মধ্যে মানুষ পার্থক্য করে থাকে। দুই মানসিকতার সম্পর্কেই কতগুলি প্রচলিত ধারণা রয়েছে, এবং একে অপরের চাইতে নিজেকে উন্নত বলে মনে করে। গ্রামের মানুষকে মনে করা হয় 'বোকা'। আর শহুরে মানুষকে গ্রামের মানুষ অবিশ্বাস করে, তারা বড় বেশি চালাক ও 'বিশ্বাসযোগ্য নয়' বলে। এধরণের পারস্পরিক ধারণা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে নিয়মিত আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে আদান প্রদান চলে আসছে। গ্রামের মতোই ছোট ছোট শহরে যজমানি প্রথা ও জাত-পঞ্চায়েতের রেশ রয়ে গিয়েছে। তবে তার প্রভাব সামান্যই।

যারা বড় শহরে বাস করতে যাচ্ছে, তাদের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। সেখানে আগের যজমানি সম্পর্ক বা জাত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। তবে নিজেদের পুরনো এলাকার সম্পর্কের জের ধরে তারা সেই সব মানুষের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হয়, অনেকটা ক্লাবে মেলামেশার মতো। তারা নিজেদের অঞ্চলের উৎসব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেও মাঝেমধ্যে একসঙ্গে হয়। অবশ্য গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে নিয়মিত গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠানো, বছরে একবার ছুটিতে গ্রামে যাওয়া এবং বিয়ে বা মৃত্যু উপলক্ষে গ্রামের ক্রিয়াকর্মে অংশ নেওয়ার মধ্যে। কিন্তু সময়ের সঙ্গেই গ্রামের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনও শিথিল হয়ে আসে, মনি অর্ডার অনিয়মিত হয়ে পড়ে, গ্রামে যাতায়াতের সংখ্যাও কমতে থাকে।

শহরের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা দরকার। জাতভিত্তিক যে অসংখ্য সংগঠন গড়ে ওঠে, তার কয়েকটি শহরভিত্তিক, কয়েকটি অঞ্চলভিত্তিক এবং বাকিগুলি সর্বভারতীয়। সব ক'টি সংগঠনই যে স্থায়ী হয়, তা নয়। তবে স্বল্প-স্থায়ী জাত-সংগঠনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সক্রিয় কর্মসূচি হাজির করে। এই সব সংগঠন অনেক সময়ই নিজেদের জাত-ব্যবস্থায় সংস্কারের কথা বলে। বিশেষ করে বিয়ে ও পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে কী করে আরও সহজ সরল করা যায়, সে নিয়ে আলোচনা তোলে। এধরণের সমস্যা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রায়শই জাত-সংগঠন 'প্রাচীনপন্থী' ও 'আধুনিক' গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। এধরণের কোনও কোনও সংগঠন নিজেদের মুখপত্র প্রকাশ করে, মন্দির নির্মাণ করে, ছাত্রাবাস ও ধর্মশালা তৈরি করে। যে সব এলাকায় তারা শক্তিশালী, সেখানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও অংশ নেয় এবং জাতের লোককে বা পছন্দের লোককে নির্বাচনে জেতাতে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করে।

গ্রাম-শহরের মধ্যে যোগাযোগ বেড়ে চলায় সমাজে দু'ধরণের আচরণ বিধি দেখা দিতে শুরু করেছে। গ্রামে মানুষ সনাতনী ঐতিহ্য অনুযায়ী ছোঁয়াছুয়ি বাঁচিয়ে

চলা, জাতের শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ মেনে চলা, স্বজাতের মধ্যে বিয়ে দেওয়া—ইত্যাদি আঁকড়ে রয়েছে। শহরে এসে এইসব নিয়ম নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে গিয়েছে। ভিড়ে বোঝাই বাসে কোন জাতের মানুষ কার পাশে বসছে, দাঁড়াচ্ছে তা বোঝা কঠিন। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানো অসম্ভব। এছাড়া হোটেল, রেস্তরাঁ ও সাধারণ ভোজনালয়ে যারা রান্না করছে বা খাবার সরবরাহ করছে, তাদের জাত-পরিচয় জিজ্ঞাসা করাও সম্ভব নয়। একই সঙ্গে স্বজাতির মধ্যে বিবাহের কড়া অনুশাসনও শিথিল হওয়ায় মোটামুটি সমমর্যাদার জাতের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন শুরু হয়ে গেল। শহরের তরুণ প্রজন্মের মানুষ নতুন পথে হাঁটতে শুরু করল, তাদের কাছে সনাতনী প্রথা ও আচরণবিধির গুরুত্ব কমে গেল।

আগের তুলনায় এখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, গ্রাম-শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেড়েছে। গ্রামের মানুষ বাস যোগাযোগের সুবাদে জেলা সদর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত করছে। সবুজ বিপ্লবের এলাকায় গ্রামের মানুষকে ট্রাক্টর বোঝাই হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে দেখা যায়। শিল্পও এখন বিশেষ করে গ্রামের নিজস্ব চাহিদার কথা মাথায় রেখে আলাদা পণ্য উৎপাদন করছে। যদিও পছন্দসই জিনিস কেনাকাটা করার জন্য গ্রাম থেকে শহরের দোকানে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বিদ্যুতের আলো ও পানীয় জলের হ্যাণ্ড পাম্প আছে, এরকম গ্রামের সংখ্যা এখন বেড়ে চলেছে। গ্রামের মানুষের কাছে ট্রানজিস্টর রেডিও এখন আর আগের মতো দর্শনীয় বস্তু নয়। সেখানে টেলিভিশন ঢুকে পড়েছে। গ্রামের সম্পন্ন ধনী পরিবারে এখন টিভি এসেছে, সরকারও সাধারণের সুবিধার জন্য গ্রামের কমিউনিটি সেন্টারে টিভি বসাচ্ছে। এর সঙ্গেই আসতে শুরু করেছে ভিডিও-পার্লার। বড় রাস্তার ধারের অনেক গ্রামে, এমনকি প্রত্যন্ত কিন্তু জনবহুল গ্রামেও ভিডিও-পার্লার ছড়িয়ে পড়ছে। নামে 'পার্লার' হলেও বেশির ভাগই খড়ের চাল—যেমন তেমন করে তৈরি বাড়িতে জমিয়ে ব্যবসা করছে। দেশি বিদেশি সফ্ট-পর্ণো সিনেমা এধরণের অধিকাংশ ভিডিও-পার্লারেও নিয়মিত দেখানো হয়। ভাষার ব্যবধান এখানে কোনও সমস্যাই হচ্ছে না। পুলিশও খুব একটা হস্তক্ষেপ করে না। এখন গ্রামের কৃষিজীবীরা শহরের ক্যাবারে দেখতে নিয়মিত ভীড় করছে। অনেক ছোট ছোট শহরেও মাঝে মধ্যে 'ক্যাবারে শো' হচ্ছে। এমনকি গ্রামীণ মেলাতেও এসবের আসর বসতে শুরু করেছে। গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠানে মাইকে জনপ্রিয় ফিল্মের গান বাজানো এখন নিয়মিত ব্যাপার-এর প্রভাব পড়ছে গ্রামীণ সংস্কৃতির উপরে। বড় বড় জনপদ বা ছোট শহরে 'কনভেন্ট' ও 'পাবলিক স্কুল' একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বেশির ভাগই বড় শহরের নামীদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অক্ষম অনুকরণ। তা সত্ত্বেও এধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ ছেলেমেয়েদের এসব জায়গায় পড়তে পাঠানোটা সমাজে 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপসাগরীয়

এলাকা থেকে আসা টাকার স্রোত (গালফ্ মানি) বিশেষ করে পঞ্জাব ও কেরলে নতুন ধরণের 'স্থাপত্য শৈলীর' জন্ম দিয়েছে। একধরণের কুৎসিৎ জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট বিরাট বাড়ি, যা সোচ্চারে টাকার উৎস ঘোষণা করে চলেছে। অনেক কৃষিসমৃদ্ধ এলাকায় 'ইংলিশ ওয়াইন শপ' সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। এসব দোকানে যা বিক্রি হয়, তা মোটেই ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয় না। এবং ওয়াইন নয়, বিক্রি হয় লিকার। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশা বাড়ার ফলে এভাবে গ্রামে লোকসংস্কৃতি ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির কিম্ভূত সংমিশ্রণ জন্ম নিচ্ছে।

গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক গুণাগুণ নিয়ে বিতর্ক অতীতেও ছিল, বর্তমানেও চলছে, সম্ভবত ভবিষ্যতেও চলবে। তবে শহরের শক্তি বা প্রভাবকে সবসময়ই কিছুটা পরোক্ষভাবে হলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিল্প ও বিদ্যার্জনের কেন্দ্র হিসাবে, রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের ভূমিকায় এবং জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে শহর বরাবরই অগ্রণী থেকে গিয়েছে। এমনকি গ্রামের মানুষকেও তারা জীবনযাত্রার স্টাইল অনুকরণ করতে শিখিয়েছে। পরিবর্তনের ঢেউও বেশিরভাগ সময়ই শহর থেকেই এসেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে ভারতীয় সমাজে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়তে শুরু করেছে। তবে এই সংঘর্ষ মোটেই গ্রামের সনাতনী জীবনযাত্রা ধরে রাখার লড়াই নয়। বরং নাগরিক জীবনের কিছু সুবিধা গ্রামের মানুষের জন্যও আদায় করতেই সংঘর্ষ চলছে। এর ফলে, দেশের শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত গ্রাম ও শহরের প্রতিনিধিস্থানীয়দের মধ্যে নতুন বোঝাপড়া হলে গ্রামের উন্নয়নে সরকার আরও মনোযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

ছয়

নগরায়ণের নানা ধরণ

1981 সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশের 76.67 শতাংশ মানুষ 5,57,137টি গ্রামে বসবাস করে। দেশের মোট জনসংখ্যার 66.52 শতাংশই কৃষি-কাজের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীণ জনসংখ্যার 10 শতাংশের সামান্য বেশি মানুষ কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। ফলে এ থেকে দেশের গ্রামনির্ভর মানসিকতা স্পষ্ট। তবে, আগেই বলেছি, এ কথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে ভারতীয় গ্রাম মাত্রই "এক একটি স্বনির্ভর ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র যারা প্রয়োজনের প্রায় সব কিছুই নিজেরা উৎপন্ন করে নেয়.....এবং বিদেশি সম্পর্ক থেকে একেবারে মুক্ত।" যিনি এ কথা বলেছিলেন, সেই চার্লস মেটকাফ এ ব্যাপারে আরও ভ্রমাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজাবদলের কোনও প্রভাবই গ্রামজীবনে পড়ে না, তারা আগের মতোই 'অপরিবর্তিত, অবিচলিত এবং স্ব-নির্ভর' থেকে যায়। এ কথা ঠিক নয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজাবদলের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামসমাজেও শক্তিবিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন এসেছে জমির ভোগস্বত্বের নিয়মে, জমির মালিকানার নিয়মেও। রাষ্ট্রীয়স্তরে পরিবর্তনের ধাক্কায় গ্রামের সমাজেও নতুন গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করে মাথা তুলেছে, জাত-পেশার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের চাইতেও গ্রামজীবন অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশার দরুণ। প্রশাসনিক, ব্যবসাবাণিজ্য ও ধর্মীয় স্তরে এই আদানপ্রদান গ্রামজীবনকে বেশি করে আন্দোলিত করেছে।

সিন্ধু সভ্যতার নগরকেন্দ্রগুলি খাদ্যের জন্য তাদের পশ্চাদভূমির উপর নির্ভরশীল ছিল। অনুমান করা কঠিন নয় যে চারপাশের গ্রামাঞ্চলের উপর ওই নগরকেন্দ্রগুলি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। এটা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব 2500 বছর আগেকার কথা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রাচীন ভারতে নানা ধরণের নগর গড়ে উঠেছিল। রাজধানী তাদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ছিল 'দুর্গ'নগরী, ব্যবসাবাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে প্রাকারবেষ্টিত 'নগর', নদী বা সমুদ্রতীরে বাণিজ্যবন্দর 'পট্টন', এবং ছোট ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র, যা 'দ্রোণমুখ' বা 'খেতা' নামে পরিচিত। নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, বদ্রিনাথ, দ্বারকা, পুরী, রামেশ্বরম, হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী, গয়া ও তিরুপতির মতো তীর্থস্থানও

প্রাচীন কালেই গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব 600 বছর আগে এদেশে প্রথম নগরগুলি স্থাপিত হয়েছিল। নগরসভ্যতার সেই ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে। বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে তাদের রাজধানীর বিকাশ হয়েছিল, পুরনো দুর্গগুলির সংস্কারের সঙ্গেই নতুন নতুন দুর্গ তৈরি হয়েছিল। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও শিখ—প্রতিটি প্রধান ধর্মই নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য ছোট বড় উপাসনাস্থল তৈরি করেছিল। সেইসময় ধর্মীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের কেন্দ্র যেমন ছিল, তেমনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার অনেক কেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলির মধ্যে কিছু টিঁকেছিল, কিছু লোপ পেয়েছিল। তার জায়গায় নতুন নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসবের মিলিত প্রভাবের সামনে সম্ভবত প্রত্যন্ত এলাকার কিছু বিচ্ছিন্ন আদিবাসী জনপদ ছাড়া আর কোনও গ্রামই আগের মতো স্বতন্ত্র ও স্ব-নির্ভর অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নি।

আগের পরিচ্ছেদে গ্রাম ও শহরের সমাজব্যবস্থার তারতম্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এখন গত একশ' বছর ধরে ভারতে নগরায়ণের যে ধারা অব্যাহত তা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। সেইসঙ্গে এর কয়েকটি সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। এমনিতে সমাজ কাঠামোর ক্ষেত্রে নগর ও শহর কোনও একক বা ইউনিট হিসাবে ধরা হয় না। কিন্তু সমাজ কাঠামোর আবশ্যিক অঙ্গগুলির উপর নগর বা শহরের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। নগর সভ্যতার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য আছে, এবং ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। তাই, ভারতের সামাজিক বাস্তবতাকে বুঝতে হলে নগরসভ্যতার বিভিন্ন মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যকে জানা দরকার।

নগরকেন্দ্রের সংজ্ঞা নির্ণয়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নগর ও গ্রামের পার্থক্যরেখা ছিল অস্পষ্ট এবং তা মোটামুটি একটা সরল মাপকাঠিতে এই পার্থক্য চিহ্নিত হত। জনসংখ্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি ছিল। গ্রামের জনসংখ্যা কম হবে, নগর ও শহরের জনসংখ্যা বেশি। কিন্তু কত বেশি হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। এছাড়া নগর বা শহরের কাজকর্মের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য ছিল। এক এক ধরণের নগরে এক এক ধরণের কাজ-পেশার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। যেমন, আগেই বলা হয়েছে, কিছু নগর ছিল প্রশাসনের কেন্দ্র (রাজধানী), কিছু ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র। কোনও কোনও নগরে এক বা একাধিক বিশেষ পেশাকে কেন্দ্র করেই কাজকর্ম বেশি হত। এছাড়া ছিল ধর্মীয় তীর্থস্থান। যে বিশেষ ধরণের কাজ বা উপযোগিতার জন্য নগরগুলি বিশিষ্ট, সেই কাজটাই প্রধান হলেও প্রতিটি নগরেই অন্যান্য কাজও কমবেশি করা হত। এভাবেই রাজধানীতেও ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠত, সঙ্গে বিদ্যাচর্চা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চার সুযোগও থাকত। ফরাসি ও পর্তুগীজরা

এদেশে খুব বেশি নগর পত্তন করেনি। কিন্তু তারা যে কয়টি নগর পত্তন করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত বজায় রয়ে গিয়েছে। এদেশে বেশিদিন থাকার সুবাদে ব্রিটিশরা এদেশের নগরায়ণে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা—এই তিন প্রেসিডেন্সি শহরপত্তনে ব্রিটিশদের ভূমিকাই মুখ্য। অনেক ছোট শহরের মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট, সিভিল লাইনস ও মল রোডের মধ্যে ব্রিটিশদের ভূমিকার সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে। এছাড়া তারা বেশ কয়েকটি হিল স্টেশন তৈরি করেছিল। তাদের তৈরি গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন পরে বড় বড় নগর ও শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, নতুন নতুন শিল্পশহর গড়ে উঠতে শুরু করে। নগরায়ণের এই প্রক্রিয়া খুব দ্রুত গতিতে এগোয় নি ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যেই তা ভারতীয় সমাজে প্রভাবে ফেলার মতো যথেষ্ট বড় আকার নিয়েছে।

1981 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে মোট 3,947টি নগর ও শহর আছে। মোট জনসংখ্যার 23.33 শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় 16 কোটি মানুষ শহরে বাস করে। 1961 সালের জনগণনার সময় 'শহর এলাকা' চিহ্নিত করার জন্য যে মাপকাঠি তৈরি হয় (পরে 1971 এবং 1981 সালে সেটাই অনুসৃত হয়) সেই অনুযায়ী এই হিসাব করা হয়েছে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী পুর কর্পোরেশন এলাকা, পুর এলাকা, টাউন কমিটি শাসিত এলাকা, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (যা নগর এলাকা হিসাবে বিবেচনাধীন) পরিচালনাধীন এলাকাকে নগর হিসাবেই ধরা হবে। এছাড়াও নগর হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে জনপদের অধিবাসীর সংখ্যা ন্যূনতম পাঁচ হাজার হতে হবে। এই জনসংখ্যার অন্তত ৭৬ শতাংশকে অ-কৃষিকাজে যুক্ত থাকতে হবে। জনপদের প্রতি বর্গমাইল এলাকায় জনবসতি এক হাজারের কম হলে চলবে না। এসব ছাড়াও বেশ কয়েকটি নাগরিক সুবিধা সেখানে থাকতে হবে, যেমন নতুন প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা, বড় আকারের হাউজিং কলোনি, বিনোদন কেন্দ্র, বিদ্যুৎ, নলবাহিত পানীয় জল, সাধারণ মানুষের জন্য বাস ইত্যাদি যান চলাচল ব্যবস্থা। 1901 সাল থেকে 1961 পর্যন্ত জনগণনায় নগরের যে সংজ্ঞা ধরা হয়েছিল, তাতে শুধুমাত্র পুরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বা সিভিল লাইনস এবং পাঁচ বাজারের বেশি জনবসতি হলেই তাকে নগর বলা হত। এছাড়াও একধরণের খামখেয়ালী পদ্ধতিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হত। জনগণনার ভারপ্রাপ্ত প্রভিন্সিয়াল সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজেই ঠিক করতেন, এধরণের কোন কোন এলাকা নগরের মর্যাদা পাবে। 1961টি সালের নতুন মাপকাঠিতে বিচার করার পর এ ধরণের 480টি 'নগর'কে আর নগরের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। 1901 সালের হিসাবে দেশে 1914টি নগর ছিল। তারমধ্যে 1961 সালে 1430টি নগরের স্বীকৃতি বজায় রয়েছে। 1951 সালে নগরের সংখ্যা ছিল 3,060টি। তা 1961 সালে কমে 2700 হয়েছে। এখন (1981 জনগণনার হিসাবে) দেশে মোট নগর-শহরের সংখ্যা 3,949টি। 1901 সালে দেশে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল 10.8 শতাংশ, এখন (1981) তা বেড়ে

23.3 শতাংশে এসেছে। 1901 থেকে 1941 সালের মধ্যে দেশের শহরবাসীর সংখ্যা 2 কোটি 58 লাখ থেকে বেড়ে 4 কোটি 41 লাখে পৌঁছেছে। 1941 থেকে 1981 সালের মধ্যে শহরবাসীর সংখ্যা বেড়ে 15 কোটি 78 লাখে পৌঁছেছে। মনে রাখতে হবে, 1981 সালের জনগণনায় অসমের হিসাব ধরা হয় নি। কারণ, সেসময় অসমে গণ্ডগোল ও রাজনৈতিক সঙ্কট চলছিল।

এভাবে 1901 থেকে 1981 সালের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শহরবাসীর সংখ্যা বেড়েছে প্রতি দশকে মাত্র দেড় শতাংশ। কিন্তু বৃদ্ধির এই সামান্য হারও, মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে বড় বড় শহরে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করছে। বিরস পরিসংখ্যানের এই খতিয়ান কিন্তু ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে—তা হল, সমাজে নগরায়ণ প্রক্রিয়া চলছে।

নিচে যে সারণী দেওয়া হল, তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর শহর ও নগরের বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান আছে। জনসংখ্যার হিসাবে প্রথম শ্রেণীর শহর—ন্যূনতম এক লাখ এবং তার বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণীর—50,000 থেকে 99,999 পর্যন্ত, তৃতীয় শ্রেণী—20,000 থেকে 49,999 পর্যন্ত, চতুর্থ শ্রেণী—10,000 থেকে 19,999 পর্যন্ত, এবং পঞ্চম শ্রেণী—পাঁচ হাজারের কম জনসংখ্যা।

সারণী 1

ভারতের শহর ও নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি, 1901-81

	শ্রেণী ও সংখ্যা					
বছর	1	2	3	4	5	6
1901	25	44	144	425	765	499
1911	26	38	158	385	742	543
1921	29	49	172	391	767	614
1931	31	59	217	474	842	571
1941	49	88	271	548	973	468
1951	76	111	368	668	1,191	622
1961	106	138	508	811	827	257
1971	150	214	643	962	797	288
1981	226	325	883	1,247	920	348
	1981—মোট জনসংখ্যা (লক্ষে)					
	830.4	220.3	268.7	176.8	69.3	11.3

নাগরিক সুবিধাযুক্ত এক লাখের বেশি জনবসতিকে সিটি বা শহর বলা হয়। বাকি সব টাউন বা নগর। শহরের মধ্যেও শ্রেণীপার্থক্য আছে, মেগাসিটি বা মহানগর—যেখানে 10 লাখের বেশি লোকের বাস। মহানগরের মধ্যে সবচেয়ে বড় চারটি হল কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি ও মাদ্রাজ। 1901 সালে গোটা দেশের মধ্যে কলকাতাই ছিল একমাত্র শহর এবং তখনকার কলকাতার জনসংখ্যা ছিল 10 লাখ। বোম্বাই এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় 1911 সালে। দিল্লি, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ মহানগর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 1951 সালে। আরও যে সব শহর এখন মহানগর শ্রেণীতে এসেছে তারা হল: আহমেদাবাদ ও বাঙ্গালোর (1961), কানপুর ও পুনে (1971) এবং লখনউ, নাগপুর ও জয়পুর (1981)। গত 1981 সালের লোকগণনার শেষে দেখা গেল, ভারতের 12টি মহানগরীতে দেশের 25 শতাংশ মানুষ বাস করছে।

শহরজীবনের বৈশিষ্ট্য

শহুরে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা, গ্রামের তুলনায় শহরে জীবনের আলাদা কতগুলি নাগরিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন।

ক. শহুরে জীবনে সনাতনী সমাজকাঠামো কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পুরনো সামাজিক অনুশাসনগুলিও অনেক দুর্বল হয়ে যায়। ফলে, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও জাতপাতের বন্ধন আলগা হয়ে যায়।

খ. মানুষে মানুষে সম্পর্কও হয়ে ওঠে অনেক বেশি ব্যক্তিসম্পর্কহীন, কেতামাফিক, নিয়মানুগ।

গ. শহরাঞ্চলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্কের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডামাথায় আখেরের হিসাব বেশি করে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। পুরনো সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানের পালন এবং আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ কমতে থাকে। জাতপাত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বোধ আর্থিক লাভক্ষতির হিসাবের তলায় চাপা পড়তে শুরু করে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরণের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

ঘ. নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন গুরুত্ব পায় এবং শ্রমের বিভাজন বৃদ্ধি পায়।

ঙ. সাধারণ মানুষের মেলামেশার জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তৈরি কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবন আবর্তিত হয়।

চ. সংস্কৃতি, শিক্ষা, মনোরঞ্জন ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট রসদ নগরজীবনে থাকে, এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়া হয়।

ছ. সমাজকে সার্বিকভাবে আধুনিকীকরণের দিকে এগিয়ে যেতে নগরজীবনই উৎসাহ জোগায়।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নগরজীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি মহানগর ও প্রথম শ্রেণীর শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ শহরই তার বুকের মধ্যে অসংখ্য গ্রামকে লালন করে চলেছে। সেখানে বংশ পরম্পরায় গ্রামীণ লোকাচার ও জীবনযাত্রার ধারাই সামান্য অদলবদল করে চলে আসছে। বড় শহরের বস্তি ও ঝুগগি ঝোপড়ির বাসিন্দারা সচেতনভাবে শহরের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেও প্রধানত গ্রামের আচার ব্যবহার ও নিয়মরীতিই সেখানে কর্তৃত্ব করে। কিছু কিছু নগর কেন্দ্র—যেমন মন্দির-শহর বা তীর্থস্থান প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার এবং সনাতনী মূল্যবোধকেই গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে। অনেক শহরের অভ্যন্তরেই সামান্য অদলবদল ও সমঝোতা করে নিয়ে সনাতনী জীবনযাত্রার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ছোট শহর, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পুরনো শহরগুলি অনেকটা ফেঁপে ফুলে ওঠা গ্রামের মতো। পুরনো ধ্যানধারণা সবই সেখানে মজবুত শিকড় গেড়ে রয়েছে। পুরনো সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ সেখানে নেই। পরিবার, আত্মীয়তা এবং জাতপাতের সম্পর্ক এসবই ওপরে ওপরে সামান্য বদলেছে। কিন্তু তাদের গুরুত্ব ও উপযোগিতা ফুরিয়ে যায় নি। ধনীরা সেখানে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে সনাতন রীতির প্রতি নিজেদের অনুরাগ প্রকাশ করে। যে কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসব ধনীদের বৈভব প্রদর্শনের রুচিহীন আড়ম্বরে পর্যবসিত হয়। গরিবরাও এধরণের অনুষ্ঠানে নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে। কারণ তাদের মানসিকতায় এসব অনুষ্ঠানই তাদের সামাজিক মর্যাদা, কর্তব্য ও জীবনের অর্থ হয়ে দাঁড়ায়। এরকম ক্ষেত্রে সব যুক্তি-বিচার ভেসে যায়। সামাজিক জীবনের নৈর্ব্যক্তিক চেহারাতেও একটু পরিবর্তন আসে। ছোট শহরের জীবনেও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা কিছু কিছু জায়গা করে নেয় ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ চিন্তাকে দূর করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। ভারতের অনেক শহর ও নগরে ধর্মকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা নিয়মিত দেখা দেয়, যা প্রায়শই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। বড় শহরের মতো এখানেও বিভিন্ন কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব এবং শ্রমের বিভাজন রয়েছে। কিন্তু গ্রাম থেকে অদক্ষ শ্রমিকের যে বিরাট বাহিনী নিয়মিত শহরে এসে ভীড় করছে, তা উপেক্ষণীয় নয়। গরিবদের সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে পুর-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই অসহায় অবস্থায় পড়ে। গরিবদের নিজস্ব যে সব কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তা বেশির ভাগ সময়ই নানা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের

আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। গরিবের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে নজর ফেরায় না। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভাল কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু টাকার অভাব ও কাজে লেগে থাকার মতো আগ্রহী কর্মীর অভাবে তারাও বেশিদূর এগোতে পারছে না। শহরের সাংস্কৃতিক ও কল্যাণকর কাজের জন্য রসদের নাগাল গরিব সাধারণ মানুষ বেশির ভাগ সময়ই পায় না। যেটুকু পায়, তা নেহাতই নাম কা ওয়াস্তে। কোনও সন্দেহ নেই, আধুনিকীকরণের তাগিদটা আসে শহরাঞ্চল থেকেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শহরের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং বাধাগুলিই আবার অগ্রগতির স্রোতকে বদ্ধজলায় ঠেলে দেয় এবং পচনে সাহায্য করে।

শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাজন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুষ্টিমেয় মানুষ অতুল বৈভবের মধ্যে বাস করে, টাকায় কেনা যায় আরামের এমন সব উপকরণই তাদের করায়ত্ত। এছাড়াও তাদের হাতে রয়েছে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ, যা দিয়ে কী করতে হবে সেটাও অনেক সময় তাদের জানা নেই। অন্য দিকে, বিরাট সংখ্যক মানুষ বাস করছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, অবমাননাকর পরিবেশে। বেকারি, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এসবই তাদের দৈনন্দিন সমস্যা। অনেক সময়ই তারা এমন পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয় যে তাদের মনোজগতে সাংস্কৃতিক বা পারমার্থিক চিন্তার লেশমাত্র থাকে না। তারাও স্বপ্ন দেখে এবং আশা করতে জানে। কিন্তু কী ভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায়, তা তারা জানে না। এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে অবস্থান করছে নির্দিষ্ট আকারবিহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তের একাংশ, যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তারা কিছুটা কল্পস্বর্গে বাস করে। ধনীদের জীবনযাত্রাকে তারা প্রাণপণে অনুকরণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে প্রতি পদে সেই চেষ্টা ব্যাহত হয়।

শহরাঞ্চলের প্রধান প্রধান সমস্যা

ভারতের শহরাঞ্চলের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে চারটি সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দেখা যাক—দারিদ্র্য, আবাসন সমস্যা, পুর-সুবিধা এবং গরিব মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের বিরাট শূন্যতা।

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই (41 শতাংশ, যদি আমরা সরকারি পরিসংখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি) গরিবি রেখার নিচে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে এই দারিদ্র্যকে যত সহজে লুকোন যায় বা মোকাবিলা করা যায়, শহরাঞ্চলে তা সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ যতই নিরাপত্তার খোঁজে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে জুটছে, এবং অভীষ্ট নিরাপত্তা পাচ্ছে না, ততই এটা চোখে পড়ছে। নিচের সারণীতে রাজ্যভিত্তিক শহরাঞ্চলের দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান দেওয়া হল—

সারণী 2

ভারত: শহরাঞ্চলের গরিব মানুষ

রাজ্য	শতকরা হারে শহরাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার গরিব অংশ
অন্ধ্রপ্রদেশ	35.68
অসম	37.37
বিহার	46.07
গুজরাত	27.02
হরিয়ানা	31.74
জম্মু ও কাশ্মীর	39.33
কর্ণাটক	43.97
কেরল	51.44
মধ্যপ্রদেশ	48.09
মনিপুর	25.98
মেঘালয়	18.16
নাগাল্যাণ্ড	4.11
ওড়িশা	12.19
পঞ্জাব	24.66
রাজস্থান	33.80
তামিলনাড়ু	44.79
ত্রিপুরা	26.34
উত্তরপ্রদেশ	49.20
পশ্চিমবঙ্গ	34.71

দারিদ্র্যের এই বিশাল চাপের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান এজন্য নিম্নমুখী হয়েছে।

বাসস্থানের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় বাসস্থানের ব্যবস্থা সামান্যই হয়েছে।

সারণী 3

ভারত : নগরাঞ্চলের আবাসন (লক্ষ)

সাল	প্রয়োজন	যোগান	ঘাটতি
1951	125	103	22
1961	157.8	140.6	17.2
1971	216.4	184.1	32.3
1981	319.4	276	43.4

শহরাঞ্চলে বহু মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এ ব্যাপারে 12টি মহানগরীর অবস্থা (1981) নিচের সারণীতে পাওয়া যাবে।

সারণী 4

12টি মহানগরীর গৃহহীন মানুষের সংখ্যা, 1981 সালের তথ্য

মহানগরী	মোট জনসংখ্যার মধ্যে গৃহহীন, শতাংশ
কলকাতা	10.40
বোম্বাই	7.15
দিল্লি	3.64
মাদ্রাজ	1.31
বাঙ্গালোর	2.34
আহমেদাবাদ	0.54
হায়দ্রাবাদ	0.87
পুনে	0.52
কানপুর	1.96
নাগপুর	0.40
জয়পুর	0.53
লখনউ	1.15

উপরের সারণীতে গৃহহীনদের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা এমনই কম যে সহজেই এ ব্যাপারে ভুল ধারণা হতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিটি শহরের মোট জনসংখ্যার তুলনায় গৃহহীনদের সংখ্যাটা বিবেচনা করা যায়, তাহলেই পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্রটা ধরা পড়বে। ছড়িয়ে পড়া ঘিঞ্জি বস্তিগুলিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা আরও বেশি।

ফুটপাথ-বাসিন্দা ও বস্তিবাসীদের জীবনের সাংস্কৃতিক চেতনার মান সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা তেমন কোনও গবেষণা করেন নি। যা পাওয়া যায়, তা কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং তার পরিসংখ্যান। বরং ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার এবং কয়েকজন অসাধারণ চলচ্চিত্রনির্মাতা—তাঁদের অন্তর্ভেদী সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বস্তিবাসীদের মধ্যে অনেক স্ত্রী-পুরুষই কঠোর পরিশ্রম করে সহজ সরল জীবন কাটায়। আবার তাদের মধ্যেই ঘাঁটি গেড়ে থাকে 'তোলা' আদায়কারী 'ডন', চোরাই মদ বিক্রেতা ও চোরাচালানকারীরা। নানা অপরাধমূলক কাজকর্মের ঘাঁটি গড়ে ওঠে বস্তিতে। সেইসঙ্গে চলে নারীমাংসের ব্যবসাও। শহরাঞ্চলের জীবনযাত্রার এটা কুৎসিৎ দিক।

সারণী 5

ভারত : মহানগরীর বস্তিবাসীদের জনসংখ্যা (1981)

মহানগরী	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	বস্তিবাসীদের জনসংখ্যার শতকরা হার
কলকাতা	91.43	35.35
বোম্বাই	82.43	38.30
দিল্লি	57.29	30.19
মাদ্রাজ	42.89	31.87
বাঙ্গালোর	29.21	10.20
আহমেদাবাদ	25.48	26.16
হায়দ্রাবাদ	25.45	21.28
পুনে	16.86	—
কানপুর	16.39	40.00
নাগপুর	13.02	—
জয়পুর	10.15	15.62
লখনউ	10.07	38.83

শহরাঞ্চলে গরিবদের জন্য সামান্যই পুর-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। কলের জল পাওয়া যায় সকাল ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার জন্য। বস্তি এলাকায় যেহেতু কলের সংখ্যা কম, তাই জল নেওয়ার জন্য কলের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে। বেশির ভাগ নলকূপই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। যে কয়টি চালু থাকে, বহু ব্যবহারে সেগুলিও জীর্ণ হয়ে পড়ে। শৌচাগার কম থাকায় বেশির ভাগ বস্তিবাসীই উন্মুক্ত জায়গায় নিয়মিত প্রাতঃকৃত্য সারে। শুয়োর ও রাস্তার কুকুর এই ময়লা কিছুটা সাফ করার দায় নেয় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে তারা রোগও ছড়ায়। বস্তি এলাকার রাস্তা ও গলিঘুঁজি কাদা ও নোংরা জলে ভর্তি থাকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে না আছে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক, না আছে প্রয়োজনীয় ওষুধ। গুরুত্বপূর্ণ জীবনদায়ী ওষুধগুলি কখনই সেখানে পাওয়া যায় না, ফলে তা দোকান থেকে কিনতে হয়। ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি স্কুলগুলির পরিবেশও যথেষ্ট নিরানন্দের। সেখানে ক্লান্তিকর নিয়মরক্ষার মতো করে পড়াশোনা চলে। সাধারণ মানুষের যানবাহন সারাক্ষণই ভীড়ে ঠাসা, যথেষ্ট ব্যয়বহুলও বটে। সিনেমা ও ভিডিও পার্লার কিছুটা বিনোদন জোগায়। বাকিটা আসে মদ্যপান, মাদক নেশা ও জুয়া খেলা থেকে।

ফুটপাথবাসী ও বস্তিবাসীদের অধিকাংশই নিজেদের ছেড়ে আসা জীবনের সনাতনী ধ্যানধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে বিশেষ করে মানসিকভাবে তারা অবলম্বন শূন্য হয়ে পড়ে। অনেকেই তাদের পরিবারকে গ্রামে রেখে এসে একা শহরে ঠাঁই খোঁজার চেষ্টা করে। শহুরে জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পেরে তারা নানা সমস্যায় পড়ে। অনেকেই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে অথবা কুসঙ্গে পড়ে। যারা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এসে শহরে আস্তানা বাঁধে, তাদেরও নানা সমস্যায় পড়তে হয়। পুরুষরা কাজে বেরিয়ে গেলে বস্তিতে মেয়েদের তেমন নিরাপত্তা থাকে না। বাবা-মায়ের কর্তৃত্ব শিথিল হওয়ার সঙ্গেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে। কেউ কেউ অল্পবয়সেই মাদক বস্তুতে আসক্ত হয়ে পড়ে। অনেকে জড়িয়ে পড়ে অপরাধচক্রের সঙ্গে। এই শহুরে বিভীষিকার মধ্যেই বিরাট সংখ্যক মানুষ জীবন যাপন করছে। যেমন, কলকাতায় মোট অধিবাসীর 35 শতাংশ মানুষই বস্তিবাসী, বোম্বাইয়ে 38 শতাংশ, মাদ্রাজে 32 শতাংশ।

উপসংহার

ভারতে নগরায়ণের হার বিপজ্জনক নয়। কিন্তু নগরায়ণের প্রক্রিয়ার যে সব বিকৃতি ও ভারসাম্যের অভাব দেখা দিয়েছে, তা উদ্বেগজনক। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের সঙ্গেই উদ্বৃত্ত শ্রমিক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে অর্থকরী কাজ খুঁজতে শুরু করবে, এটাই প্রত্যাশিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাম থেকে এভাবে শহরে এসে ভীড় বাড়ানোর

প্রবণতা অব্যাহতই থাকবে, শহর প্রতিনিয়ত গ্রামের মানুষকে হাতছানি দিয়ে আকর্ষণ করে যাবে। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে চলবে। এটা ঠেকানো সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এর ফলে যে বিকৃতি দেখা দিচ্ছে, তা আটকাতে হলে গ্রাম থেকে শহরে আসার ব্যাপারে আরও সতর্ক পরিকল্পনা ও দক্ষ হাতে তা রূপায়ণ করা দরকার।

এধরণের স্থানান্তরিত মানুষদের জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে সব জায়গায় এদের থাকার জন্য কলোনি গড়ে তোলা হবে, সেখানে পরিকল্পিতভাবে বাসস্থান, যানবাহন ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী, রোগ প্রতিরোধে এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, শিক্ষা এবং বিনোদনের সুযোগ থাকা দরকার। লাগামহীন নগরায়ণ, এবং কম-নগরায়ণ—দুটোই বিপজ্জনক প্রবণতা। লাগামহীন নগরায়ণ, যেখানে পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ সুবিধা ছাড়াই জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, এবং কম-নগরায়ণ,—যেখানে চাষের জমিকে ক্রমশই বেশি করে অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং পরিণতিতে ওই এলাকা পার্শ্ববর্তী নগরের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। গরিব মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং তাদের জীবনযাপনের একটা সর্বজনগ্রাহ্য মান নিশ্চিত করা দরকার। যতদিন পর্যন্ত এটা না করা হচ্ছে, ততদিনই বস্তিগুলি শহরের বুকে পচনশীল ক্ষতের মতো থেকে যাবে এবং নাগরিক জীবনের সুরে মাঝেমধ্যেই ছন্দপতন ঘটাবে। এমনকি, পরিস্থিতি বিস্ফোরক আকারও নিতে পারে।

সাত

স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক

ভারতীয় সমাজে মেয়েদের স্থান ঠিক কোথায়, তা নিয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। কয়েকটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে নারীকে মহিমান্বিত করার প্রয়াসে বলা হয়েছে, "যেখানে নারী পূজিত হন, সেখানে স্বয়ং ঈশ্বর অবস্থান করেন।" দুর্গা, কালী, চণ্ডী এবং আরও বহু নামে ও রূপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃপূজা প্রচলিত। মনে করা হয়, এই দেবীমাতৃকা রূপ সম্ভ্রম ও ভয় দুয়েরই উদ্রেক করতে সক্ষম। শক্তিরূপিণী নারী একদিকে যেমন রক্ষাকর্ত্রী, অন্য দিকে প্রয়োজনে প্রতিশোধ নিতেও তৎপর। দেবী সন্তুষ্ট হলে যে কোনও বর দিতে পারেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হলে প্রলয় ঘটাতে পারেন। দেবতারাও এই দেবীমাতৃকার সামনে অসহায় এবং দেবী কোনও কাজে কৃতসঙ্কল্প হলে তাঁরা তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন না। দেবীর কিছু কিছু গুণ বা শক্তি প্রতিটি নারীর মধ্যেই থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়।

কিন্তু নারীর আর একটি রূপও ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ ও লোকগাথার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। সেখানে নারীর চরিত্র দুর্বল ও চপলা। নারী হল স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ, শয়তানের মতো কুপথে যাবার প্রলোভন দেখায়, মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে বাধে না। লোভ, প্রবঞ্চনা, অশুচি তাকে ঘিরে রয়েছে এবং কোনও ভাবনা চিন্তা ছাড়াই কাজ করার প্রবণতা তার যথেষ্ট। ফলে, নারীকে সব পাপের মূলে বলে মনে করা যেতেই পারে। নারী চরিত্রে যেহেতু সংযমের অভাব, তাই তাকে সবসময় কড়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার। নারী দুর্বল হওয়ায় তাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে স্বামীর মৃত্যুর পরে পুত্রের অধীনে তাকে থাকতে হবে।

নারীর এই দুই রূপচিত্র একেবারে পরস্পরবিরোধী। সমাজে অবশ্য নারীর দ্বিতীয় রূপচিত্রই, অর্থাৎ নানাচরিত্রের বিকৃত এবং নিন্দার্হ চিত্রটিই বেশি করে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশিষ্ট কবি তুলসীদাসও তাঁর একটি বহু উদ্ধৃত দোঁহাতে মেয়েদের নিরক্ষর, শূদ্র ও গোরু ছাগলের সঙ্গে তুলনা করে পরামর্শ দিয়েছেন, মেয়েদের সৎপথে রাখতে নিয়মিত শাস্তি দেওয়া দরকার। অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে করায় মেয়েদের এমন অনেক অধিকার ও সুবিধাই ছেড়ে দিতে হয়েছে, যাতে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত।

মেয়েদের পদানত করার এই চিন্তা, যা একান্তই হিন্দু ধর্মের ব্যাপার ছিল, তা ক্রমে অন্যত্র ছড়িয়ে যায় এবং প্রায় গোটা ভারতীয় সমাজেরই মানসিকতা ও বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীতে ঢুকে পড়ে জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্যই কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে, যেখানে মেয়েদের অনেক বেশি মাত্রায় সমানাধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণ করা হয়? প্রথমত, মেয়েদের যৌনতাকে ছেলেদের তুলনায় অনেক কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। মেয়েরা অনেক সহজেই অপবিত্র হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে এধরণের ঘটনায় পরিবারের সুনাম কলঙ্কিত হয়। এই কলঙ্কের ভাগ যে পরিবারে মেয়ের জন্ম, এবং যে পরিবারে বিবাহ হয়েছে, দুয়ের উপরেই বর্তায়। মেয়েদের 'পবিত্রতা' বজায় রাখার তাগিদেই রজঃস্বলা বা প্রথম ঋতুমতী হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে দেওয়ার চল ছিল। মেয়েদের যৌনতার উপর এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটাও লুকিয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েরা কোথায় যাবে এবং কার সঙ্গে মিশবে, এব্যাপারেও কড়া নিয়ন্ত্রণ আছে। এর পিছনে যে চিন্তা কাজ করেছিল বলে মনে করা হয়, তা হল, মেয়েরা যেন সহজে প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে যৌন-মিলনের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা নিষেধ ভুলে না বসে। এইসঙ্গেই মেয়েদের সম্পত্তি, টাকাকড়ি, শ্রম ইত্যাদিও যেন অন্যের ভোগে না লাগে সেটাও দেখা হয়। সমাজের নিচের তলার মেয়েরা অবশ্য সংসার চালানোর তাগিদেই নানা কাজ হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের নিয়মিত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে হয়। তাই মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও শাসন সাধারণত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারেই বলবৎ থাকে। তৃতীয়ত, এটাও মনে করা হয় যে মেয়েদের সম্পদের উপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখা দরকার। বেশির ভাগ মেয়ের ক্ষেত্রেই তাদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা ছাড়া অন্য সম্পদ নেই। তারা বাইরের কাজে বেতনভুক্ত কর্মী হতে পারে, পারিবারিক পেশায় যুক্ত হতে পারে বা বিশেষ কোনও দক্ষতা থাকলে তা কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাদের স্বোপার্জিত আয়ের কতটা অংশ তারা নিজেদের ইচ্ছেমত খরচ করতে পারে, কতটাই বা তারা জমাতে পারে এবং পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্যই বা তাদের কতটা দেওয়া উচিত? সমাজের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা বিয়ের সময় পিত্রালয় থেকে অনেক সময়ই কিছু সম্পদ নিয়ে আসে, যা আইনের চোখে 'স্ত্রীধন' বা তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু এই স্ত্রীধন কী মেয়েরা নিজের ইচ্ছায় কাজে লাগাতে পারে? নাকি, পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে বা আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলায় ওই 'স্ত্রীধন' কাজে লাগানোর জন্য তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়?

যে সব পদ্ধতিতে মেয়েদের জীবনের উপর এইসব নিয়ন্ত্রণ বসানো হয়, তা অনেকটাই সামাজিক কাঠামো, সামাজিক ভূমিকা বণ্টন, মূল্যবোধ এবং সামাজিক

নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা ও শিথিলতার উপর নির্ভরশীল। ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে বার বার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে।

কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, ভারতীয় সমাজ পুরুষশাসিত ব্যবস্থা। পুরুষশাসিত ব্যবস্থায় সমাজে পুরুষের ভূমিকা মুখ্য এবং নারীর ভূমিকা গৌণ হিসাবে দেখা হয়। বিবাহসূত্রে নারী তার পিতৃবংশ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে এবং স্বামীর পরিবারের সদস্যপদ লাভ করে। তার সন্তানরা তার স্বামীর বংশের ধারা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পরিবারের কর্তৃত্ব থাকে পুরুষের হাতে, বেশির ভাগ সময় পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তানের হাতে। পরিবারের কর্তাই সবরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী, যদিও সে পরিবারের অন্য পুরুষদের সঙ্গে প্রয়োজনে পরামর্শ করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা বা উপস্থিতি সেরকম চোখে না পড়লেও অনেক সময় তা বোঝা যায়। দৃঢ়চেতা মহিলারা অনেক সময়ই মাথা তোলার চেষ্টা করে থাকেন। তবে তাঁরা বেশির ভাগ সময়ই আড়ালে থেকে কাজ করেন। এমনকি অপেক্ষাকৃত কম বয়েসের মহিলাদেরও আড়ালে থেকে সুতো টানতে দেখা যায়। তাই পারিবারিক কোন্দল ও ঝগড়ায় মেয়েদের ভূমিকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে পুরুষের সার্বিক প্রভুত্বকে গুরুত্বসহকারে চ্যালেঞ্জ করতে তাদের বড় একটা দেখা যায় না। যখন এরকম ঘটে, তখন পরিবারে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশ্যই কিছু কিছু পরিবারে মহিলাকে কর্ত্রী হিসাবে দেখা যায়। কিন্তু তা ঘটে যখন পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিবারের কাজ দেখাশোনার জন্য মহিলারা ছাড়া আর কেউ নেই। সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই জ্যেষ্ঠ সন্তানের হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব ফিরে আসে।

অধিকাংশ আদিবাসী সমাজই পুরুষশাসিত। তবে সেখানে পুরুষদের কর্তৃত্ব এতটা সোচ্চার নয়। আদিবাসী রাজা বা সর্দারের পরিবার শুধু ব্যতিক্রম, তা পুরোপুরি পুরুষশাসিত। আদিবাসী মেয়েদের ক্ষেতে, বনে জঙ্গলে কাজ করতে যেতে হয়। তাই তাদের ঘোরাফেরার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বও তাদের কম নেই। নিয়মরক্ষার খাতিরে তারা পুরুষদের কর্তৃত্ব মেনে চলে, এবং পুরুষরা প্রয়োজনে তাদের শাসন করতেও পারে। কিন্তু মোটের উপর আদিবাসী সমাজের মেয়েরা অনেক বেশি সমানাধিকার ভোগ করে।

ভারতে বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি জায়গায় মাতৃকুলকেন্দ্রিক সমাজ রয়েছে, তবে আগেই বলা হয়েছে যে সেখানে নারীশাসিত সমাজব্যবস্থার চিহ্ন নেই। মাতৃকুলনির্ভর সমাজে মেয়েদের দিক থেকেই বংশের ধারা অনুসৃত হয়। কিন্তু সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরুষের হাতেই ন্যস্ত থাকে। জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি বংশপরম্পরায় মেয়েরা পায়, কিন্তু তা দেখাশোনার কাজটা ছেলেদের হাতেই থাকে। মাতৃকুলকেন্দ্রিক সমাজে মেয়েদের কিছুটা বিশেষ মর্যাদার আসন দেওয়া হলেও ছেলে ও মেয়েদের

কাজের আলাদা আলাদা ক্ষেত্র স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। এ বিষয়ে একটি খাসি প্রবাদ হল— "যুদ্ধ ও রাজনীতি পুরুষদের কাজ, আর সম্পত্তি ও সন্তান দেখাশোনা করবে মেয়েরা।" খাসিসমাজে রাজা, সর্দার এবং ক্ষমতাশালী গ্রামপ্রধান—সবাই পুরুষ। কিন্তু মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দায়িত্ব আছে। খাসি রমণী ছোট ছোট দোকান চালায়, স্থানীয় স্তরে কেনাবেচা করে। কেরলে হিন্দুসমাজেরই একাংশ নায়ার সম্প্রদায়। নায়াররা জমির মালিক হলেও নিজেরা চাষ করে না। নায়ার সমাজের মেয়েরা সাধারণত ঘরের কাজেই ব্যস্ত থাকে এবং ছেলেরা সেনাবিভাগে চাকরি করে। নায়ার পরিবারে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার মেয়েদের উপরেই বর্তায়, কিন্তু যে এটা দেখাশোনা করে বা ম্যানেজারের দায়িত্ব নেয়, সে অবশ্যই পুরুষ। তাকে 'করণাবর' বলা হয়। লাক্ষাদ্বীপের মাতৃকুলকেন্দ্রিক পরিবারগুলিতেও মোটামুটি একই প্রবণতা দেখা যায়। শুধু কেরল ও কর্ণাটকের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মাতৃকুলকেন্দ্রিক সমাজে মেয়েদের পরিবারের কর্তৃত্ব ও পরিচালন দায়িত্ব দেওয়ার রীতি আছে।

এখন মাতৃকুলকেন্দ্রিক পরিবার ও সমাজ ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে। সামাজিক পরিবেশই তাদের বদলাতে বাধ্য করছে। বাজার অর্থনীতি, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, এক জায়গা থেকে বাস উঠিয়ে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র যাতায়াতের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, কাজের নতুন নতুন সুযোগ বৃদ্ধি—এসবই পরিবর্তন ঘটানোর মুখ্য কারণ। অপরিচিত পরিবেশে, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানকেন্দ্রিক পরিবারে মাতৃকুলনির্ভর পুরনো প্রথা বজায় রাখা কঠিন। নায়ারদের 'তারাওয়াদ'ও দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে, কারণ নতুন আইনে বিয়ের আগেকার ভিত্তিকেই কিছুটা বদলে দিয়েছে। এখন মেয়েদের সঙ্গেই ছেলেদেরও পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বোপার্জিত সম্পত্তির কথা বিবেচনা করে খাসিসমাজও উত্তরাধিকারের প্রচলিত নিয়ম বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে। তবে মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের চিন্তাধারা সহজে মুছে যাবার নয়। কারণ, মেয়েরা এই চিন্তাকে পুষ্ট করে যাবে এবং সম্পত্তির অংশের উত্তরাধিকারও তাদের থেকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে মেয়েরা সমাজের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দাবি করে যাবে, যা একদা প্রাচীন যুগে তাদের দেওয়া হয়েছিল।

সমাজে কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে 'ছেলেদের কাজ' ও 'মেয়েদের কাজ' বলে পার্থক্য করা হয়। বাড়ির কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবীভাবে মেয়েদের উপর ন্যস্ত হয়। যদি তারা ভৃত্যের সাহায্য নিতে অক্ষম হয়, তাহলেও জল টানা, রান্না, ঘরদোর সাফ করা, বাড়ির সবার জামাকাপড় কাচা এবং ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার কাজ তাদেরই করতে হয়। খুব কম সংখ্যক পরিবারেই গৃহভৃত্য নিয়োগ করার সামর্থ্য থাকে। পুরুষরা বাড়ির কাজে হাত লাগালে ব্যঙ্গের খোরাক হয়। যদি স্ত্রী বাপের বাড়ি যায়, বা অসুস্থ থাকে বা বাড়িতে কোনও স্ত্রীলোক না থাকে, একমাত্র তাহলেই পুরুষ নিজে বাড়ির কাজ করতে পারে। এই মানসিকতা

এমন গভীরে ঢুকে গিয়েছে যে এমনকি যে সব মহিলা এখন পুরো সময় বাইরে নানা পেশায় যুক্ত, তারাও বাড়ি ফিরে বাড়ির সব কাজ করবে বলে আশা করা হয়। অনেক মহিলা বাইরের কাজের চাপে বাড়ির কাজে পুরো মনোযোগ দিতে না পারার জন্য অপরাধবোধে ভোগেন। অন্যদিকে, পুরুষরা বাড়ির বাইরের জগৎ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে বলে আশা করা হয়। সংসার চালানোর ব্যয়ভার তারাই নেবে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে গৃহবিবাদ মেটাতে তাদের ডাক পড়ে।

পুরুষ প্রভুত্ব খাটায় ঠিকই, কিন্তু মেয়েদেরও নিজেদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিজস্ব রাস্তা আছে। নিচুজাতের বা নিচুশ্রেণীর পরিবারের মেয়েদের সাংসারিক আর্থিক দায় অনেকটাই বহন করতে হয়। তারা নিজেরা মাঠে হাল চালায় না ঠিকই, কিন্তু চাষের কাজে তাদেরও সক্রিয় ভূমিকা থাকে। কুমোর, তাঁতি প্রভৃতি পেশার কারিগর-পরিবারে জাত-পেশার কাজে মেয়েদেরও নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। তাই পারিবারিক আয়ে তাদের অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। সমাজের উঁচুতলায় এতদিন পর্যন্ত পুরুষই পরিবারের হয়ে উপার্জন করত। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতিও দ্রুত বদলাচ্ছে। মেয়েরা এখন ক্রমশই বেশি করে বিভিন্ন পেশায় যোগ দিয়ে নিয়মিত উপার্জন করতে শুরু করেছে। জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান খরচের সঙ্গে পাল্লা দিতেই মেয়েদের এই ভূমিকা পুরুষশাসিত সমাজ কিছুটা মেনে নিতে শুরু করেছে। কিন্তু স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত হতে পুরুষ মোটেই পছন্দ করে না। এবং স্ত্রীর আয় পুরুষের চাইতে বেশি হলে তার অহংবোধে আঘাত লাগে। এই নতুন বিকাশমান সামাজিক চিত্র পুরুষশাসিত সমাজের অনুকূল নয়। কিন্তু অতীতের জের এখনও যথেষ্ট চাপ বজায় রেখেছে। এরই মধ্যে দিয়ে সমাজ এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। যদিও এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হচ্ছে খুবই ধীর গতিতে।

হিন্দু সমাজের পুরুষকেন্দ্রিক অংশটি মেয়েদের কাছে অনেকগুলি গুণ আশা করে। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কুমারীত্ব। বিয়ের আগে কোনও পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করা চলবে না। বিয়ের পরে স্বামী ছাড়া আর কারও সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় গুণ—পতিভক্তি। 'পতি পরমেশ্বর'—অর্থাৎ স্বামীই সবচেয়ে বড় ভগবান, এই চিন্তা ভালভাবেই তুলে ধরা হয় এবং একই স্বামীকে জন্ম-জন্মান্তরে পাওয়ার আশায় স্ত্রী নানা সময় উপবাস করে থাকে। এধরণের উপবাসে একই সঙ্গে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনাও জড়িয়ে থাকে, যাতে স্ত্রীকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। স্বামীর চিতার আগুনে স্ত্রীর নিজেকে বিসর্জন দেওয়ারই নাম 'সতীপ্রথা'। অবশ্যই আইন করে এই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে, এবং এখন দেশে সতীদাহের ঘটনা খুবই কম হয়। কিন্তু যেটা উল্লেখযোগ্য, তা হল 'সতী'র দৃষ্টান্ত হিন্দু মানসিকতায় এখনও শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। সতীদাহের

জায়গাকে অনেক সময়ই ধর্মীয় পীঠস্থান হিসাবে গড়ে তোলা হয় এবং দূরদূরান্ত থেকে মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য সেখানে সতীমেলার আয়োজন হয়। তৃতীয়ত, আশা করা হয়, বিয়ের পর স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের আচার ব্যবহারের আদলে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলবে এবং নিজের সত্ত্বাকে পুরোপুরি স্বামীর পরিচয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। স্ত্রী স্বামীর 'ছায়া মাত্র' হয়ে উঠবে, এবং স্বামীর অনুসরণ করে চলবে এটাই প্রত্যাশিত। সঙ্কটে স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াবে, তাকে শক্তি জোগাবে।

মনে রাখা দরকার, মেয়েদের কাছে প্রত্যাশিত এসব গুণই আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু অনেকেই এই সব গুণের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে না। তাই, বহু জাতি ও সম্প্রদায়, বাস্তবিক সমাজের একটা বড় অংশই বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে। দরিদ্র পরিবেশে এসব 'আদর্শ' গুণ ধরে রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। আদিবাসী সমাজে ও মাতৃকুলকেন্দ্রিক সমাজে মেয়েদের আচার আচরণ সংক্রান্ত অনুশাসন কিছুটা আলাদা। তবে মিতব্যয়, কঠোর পরিশ্রম, পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি যত্ন নেওয়া ইত্যাদি মেয়েদের গার্হস্থ্য গুণকে সব সমাজেই মূল্য দেওয়া হয়। মেয়েদের নিঃসন্তান হওয়াটা একটা অভিশাপ বলে গণ্য হয়। পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে বংশধারা বজায় রাখতে মেয়েরা পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে, এটাই আশা করা হয়। মাতৃকুলকেন্দ্রিক সমাজে সেরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, যদিও হলে ভালই। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের মতোই মাতৃকুলকেন্দ্রিক সমাজেও সন্তান উৎপাদনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েই দেখা হয়।

সমাজে নিয়ন্ত্রণ কতটা আঁটসাঁটো তার উপরেই নির্ভর করছে সামাজিক অনুশাসন ও মূল্যবোধ কতটা মেনে চলা হবে। কী করা উচিত, এবং কী অনুচিত, কোনটা শ্রেয়, কোনটা শ্রেয় নয়, শুধু তা বলে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সমাজ সনাতন মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যখন অটুট, তখনও সমাজপতিদের হস্তক্ষেপ এবং জাত-পঞ্চায়েতের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দরকার হয় বিবাদ মীমাংসা এবং বিদ্রোহীদের বুঝিয়ে সমাজের অনুশাসন মেনে চলতে রাজি করতে। উঁচু জাতের মানুষের সম্মান-অসম্মান বোধ অনেক তীব্র। তারা নিজেদের ঘরের বিবাদ প্রকাশ্যে যাতে না এসে পড়ে সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এ জন্য পরিবারের মধ্যে গুরুতর বিবাদ দেখা দিলে পরিবারের গুরুজনরাই তা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে মেয়ের বাপের বাড়ি এবং অন্য প্রবীণ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও পরামর্শ করা হয়। নিচুজাতের পরিবারের ঝগড়া বিবাদ অবশ্য গোপন থাকে না, সহজেই তা প্রকাশ্যে এসে পড়ে। ফলে সমাজের হস্তক্ষেপ দরকার হয়। নিচুজাতের মানুষও মান-অপমান সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এ নিয়ে জেদ আঁকড়ে থাকার সুযোগ তাদের কম। তাই পরিবারের সম্মানরক্ষার উপায় খোঁজা হয় বউ পেটানো এবং বউকে ফুসলানোর জন্য অভিযুক্তকে পেটানোর মধ্যে। পরিবারের অন্দরমহলে নিয়মিত

যে মারধর ও হিংসাত্মক কাজ চলে, তার পরিমাপ করা কঠিন। নিচুজাতের পরিবারে এটা স্পষ্টই চোখে পড়ে, কিন্তু উঁচুজাতের পরিবারগুলিতেও এধরণের অত্যাচার কম ঘটে না। স্বাধীনতার চার দশক পরেও এখন সংবাদপত্র প্রায়ই বউ পুড়িয়ে মারা ও পণের জন্য বউ-মারার ঘটনা চোখে পড়ে। এছাড়াও মেয়েদের উপর অন্য অনেক ধরণের নিপীড়ন চলে। বউকে নিয়মিত গঞ্জনা দেওয়া বউয়ের বাপের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলা, বাড়িতে বউয়ের কাঁধে যত বেশি সম্ভব কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, কম খেতে দেওয়া এবং নানাভাবে মানসিক অত্যাচার করা হয়। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও উচ্চ শিক্ষিতা এবং কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলারাও এধরণের নিপীড়নের শিকার হন।

স্ত্রী-পুরুষের এই বৈষম্যমূলক সম্পর্ক ও মেয়েদের উপর অবিচারের দিকে এখন সমাজ-সংস্কারকদের চোখ পড়েছে। মেয়েদের সমর্থনে অনেকেই এগিয়ে আসছেন। মধ্যযুগের কয়েকজন সন্তকবি মেয়েদের প্রতি আরও মানবিক ও ন্যায় আচরণ করার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালের কিছু কিছু সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময়েও সমাজে মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। যেমন, ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ সম্বন্ধীয় আন্দোলন, এবং মুসলমান সমাজেরও কিছু সংস্কার আন্দোলনের ঘোষিত কর্মসূচিতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল। সাধারণভাবে সামাজিক ও আইনী বৈষম্যের বিরোধিতা করার সঙ্গেই বাল্যবিবাহজনিত সমস্যার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিল। এছাড়া নারী শিক্ষা ও নারীর সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেছিল।

ব্রিটিশরা এদেশ শাসনকালে, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম যে কোনও সমাজ-সংস্কারের কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সমাজে তখন গোঁড়ামি প্রচণ্ড এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সামাজিক বিষয়ে যে কোনও ধরণের হস্তক্ষেপের চেষ্টাই কড়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হত। তা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কারকদের চাপের মুখে তাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পিছু হঠতে হয়েছিল—যেমন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হল (1829), বিধবা বিবাহ আইন পাস (1856), শিশুকন্যা হত্যা নিষিদ্ধ হল (1870), স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে (1872) অসবর্ণ বিবাহ আইন সিদ্ধ, বাল্যবিবাহ ঠেকাতে আইন (1921), সম্পত্তিতে মেয়েদের আংশিক অধিকার স্বীকৃত হল (1937)।

সমাজের কুআচারের বিরুদ্ধে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হল সতীদাহ প্রথা রোধ। এরফলে মেয়েরা অনেক মর্মান্তিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেল। কিন্তু স্বামীর চিতার আগুনে পুড়ে স্ত্রীর 'সতী' হওয়ার মাহাত্ম্য প্রচার এখনও অব্যাহত। 1986 সালে রাজস্থানের 'রূপ কানোয়ার' ঘটনা এমনই একটি স্পর্শকাতর আবেগতাড়িত বিষয় হয়ে ওঠে, যাকে কেন্দ্র করে 'সতীপ্রথা'র পক্ষে বিপক্ষে

বহু মানুষ পরস্পর ভাগ হয়ে গিয়েছিল। উচ্চবর্ণ সমাজে, এখনও বিধবাদের নিচুনজরে দেখা হয়। যদিও ইদানিং বর্ণহিন্দু সমাজের সামান্য কিছু বিধবা নারী বন্ধন ছিন্ন করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সাহস দেখাচ্ছে। শিশুকন্যা হত্যা এখনও অব্যাহত। প্রতি বছর দেশে পুত্রসন্তানের চাইতে তিন লাখ বেশি কন্যাসন্তান শিশু অবস্থায় মারা যায়। এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যাসন্তানের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলাই মৃত্যুর কারণ। সমাজে এখনও কন্যাসন্তানকে 'বোঝা' মনে করা হয়। চিকিৎসাসংক্রান্ত একটি আধুনিক পরীক্ষা ব্যবস্থার (amnicentesis) সুবাদে এখন ভ্রূণ অবস্থাতেই লিঙ্গ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এরফলে কন্যা-ভ্রূণ হত্যা বাড়তে শুরু করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 1984 সালে শুধু বোম্বাই শহরেই 40,000 কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছিল। এখন এধরণের পরীক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ প্রায় সব শহরেই পাওয়া যাচ্ছে।

সমাজে ভিন্নজাতের মধ্যে বিবাহ, অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহের হার এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আইনে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহের ঘটনাও বিরল নয়। গোড়ায় আইনে বিবাহের ন্যূনতম বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছিল মেয়েদের জন্য 15 এবং ছেলেদের জন্য 18 বছরে। পরে তা সংশোধন করে মেয়েদের জন্য 16 এবং ছেলেদের জনা 21 বছর করা হয়। কিন্তু এখনও দেশের কোনও কোনও এলাকায় বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গণবিবাহের আয়োজন হয়, সেখানে একেবারে কোলের শিশুরও বিয়ে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পরে দেশে মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে এবং সম্পত্তির অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও তাদের কিছুটা স্বীকৃতি বেড়েছে। কিন্তু এখনও মেয়েদের বহু গুরুতর সমস্যার সমাধান হয়নি। মন্দিরে দেবদাসী বা 'যোগন' হিসাবে ছোট ছোট মেয়েদের উৎসর্গ করার আড়ালে তাদের দেহব্যবসায়ে নামানো হয়। পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও কন্যাসন্তানের নিরাপত্তা কমই, অনেক সময় ওই পরিবেশের মধ্যেও তাকে যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয়। সামাজিক চেতনা না বাড়লে, এবং সেই অনুযায়ী সচেতন সামাজিক হস্তক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের জন্য ভাল ভাল আইন শুধু ফাঁকা আশ্বাসেই থেকে যাবে।

হিন্দু সমাজের নিচুতলা থেকে শুরু সংস্কার আন্দোলনও মেয়েদের ইস্যুকে তুলে ধরেছিল। যেমন, জ্যোতিবা ফুলে-র 'সত্য শোধক সমাজ' আন্দোলন। গান্ধীজি মেয়েদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করে নিয়ে তাদের পায়ের বেড়ি খুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বরাবর মেয়েদের মর্যাদার দাবি জানিয়ে এসেছেন। স্বাধীনতার পরে সমাজে মেয়েরা এখন অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। পুরুষদের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া অনেক ক্ষেত্রেই এখন মেয়েদের দাপটের সঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের বৈষম্য রয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতার পরে নতুন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আইন ও শিক্ষার

সাহায্যে দেশের সামাজিক অচলায়তনকে দ্রুত বদলে দেওয়া যেত। কিন্তু দেশের নেতারা সম্ভবত সাবধানে পা ফেলে এগোতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত সনাতন রীতি ও আচারে বাঁধা সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্পর্শকাতর মানসিকতাকে তাঁরা আঘাত দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সতীদাহ প্রথা বিলোপের পর থেকেই মেয়েদের স্বার্থে আঘাত করে এমন অনেক বিষয়েই প্রতিকারের চেষ্টায় আইন করা হয়েছে। যেমন, বহুবিবাহ প্রথাকে ঠেকানোর চেষ্টা হয়েছে। মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়ানো হয়েছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন হয়েছে। অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আইন সংশোধিত হয়েছে। স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য নতুন আইন হয়েছে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের আগের তুলনায় সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এতসব আইন হলেও বাস্তবে তা কার্যকর করতে নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে মেয়েদের সব পাওনা সুবিধাই হারিয়ে যাচ্ছে। হিন্দু কোড ইতিমধ্যেই সনাতনী প্রথা রীতির সঙ্গে সমঝোতা করে বসেছে, ফলে মেয়েরা পারিবারিক সম্পত্তিতে তাদের আইনমাফিক অংশ পেতে হিমসিম খাচ্ছে। 'স্ত্রীধন'-এর উপরেও তাদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এখন মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আগের তুলনায় বেশি সংখ্যায় মেয়েদের শিক্ষায়তনে আসতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও ছেলেদের তুলনায় স্কুল-কলেজে মেয়েদের ভর্তির হার কম। মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার হার উদ্বেগজনকভাবে বেশি। চাকুরিক্ষেত্রে নতুন যে সব সুযোগ বাড়ছে, মেয়েরা তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। চাকুরিক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বজায় রয়েছে। ফলে জনসংখ্যার তুলনায় চাকুরির ক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতির হার এখনও অনেক কম। একই অবস্থা রাজনীতির অঙ্গনেও।

নির্বাচনে মোট আসনের 30 শতাংশ মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 1989 সালে শাসক কংগ্রেস দল করেছিল। কিন্তু তা করা হয় নি। এব্যাপারে বিরোধীদের রেকর্ডও খুব উজ্জ্বল নয়। 1989 সালের নির্বাচিত লোকসভায় তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি ছিল।

ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার সুবাদে মেয়েদের প্রতি নানা ধরণের। বৈষম্যের জন্ম হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী আইনের চোখে সবাই সমান। সংবিধান এটাও বলে যে ধর্ম, জাতি, জাতপাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কিন্তু সংবিধানই ধর্মকে লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। যে কেউ তার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে ও পালন করতে পারে। ধর্মের এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা মেয়েদের সংবিধান প্রদত্ত সমানাধিকার সহ অনেক বিষয়েই স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। যেহেতু পরিবার ও ব্যক্তিগত আইন ধর্মীয় কোডের সঙ্গে যুক্ত, তাই মেয়েরা পরিবারের সদস্য হিসাবে সমমর্যাদা পায়

না। তাদের সম্পত্তির অধিকারও একই কারণে খর্ব হয়েছে। বিয়ের পরে কোথায় বাস করবে, এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা অনেক মেয়েরই নেই। বিবাহবিচ্ছেদ হলে অনেক স্ত্রীই খোরপোষ পায় না। অনেককে ডিভোর্স পেতেও প্রচণ্ড কাঠখড় পোড়াতে হয়। আইনমাফিক দত্তক নিতেও তাদের অনেক বাধার সামনে পড়তে হয়। সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভিন্ন দেওয়ানি আইন (uniform Civil-Code) করার জন্য সাহসী কথাবার্তা মাঝেমধ্যে শোনা যায় ঠিকই। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী ও স্বার্থান্বেষী মহলের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই দেশের রাজনৈতিক নেতারা মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। এধরণের পদক্ষেপের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, যার পরিণতিতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সমর্থন হারানো ও ভোটব্যাঙ্ক হারানোর নিশ্চিত আশঙ্কাই এই প্রগতিশীল আইন প্রণয়নের পথ আগলে রয়েছে। ফলত, মেয়েদের সমানাধিকার প্রাপ্তির আশা এখনও দূরঅস্ত।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এখনও লিঙ্গবৈষম্য বা মেয়েদের প্রতি বৈষম্যকে বজায় রাখার প্রক্রিয়াই অব্যাহত রয়েছে। সমাজে পুরুষের সমানাধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারতীয় মেয়েদের এখনও দীর্ঘ, কষ্টকর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে বলেই মনে হয়।

আট

পরিবর্তনের ধারা

এখনকার ভারতীয় সমাজ একগুচ্ছ পরস্পরবিরোধিতায় আবদ্ধ। এই সমাজের কয়েকটি পরস্পরবিরোধী দিক যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। যেমন, চারদিকে মাত্রাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো প্রাচুর্যের দৃষ্টিকটু আয়োজন। একদিকে, এই সমাজ আধ্যাত্মিকতার বড়াই করে। অন্যদিকে এই সমাজেরই অভিজাতশ্রেণী ও ধনীরা ভোগবিলাসের এমন আড়ম্বর করে, যা রীতিমত অনৈতিক। সমাজের নয়া-আধ্যাত্মিকতার কয়েকজন গুরু মহেশ যোগী, রজনীশ, বাল যোগেশ্বর প্রমুখ। এঁরা সবাই পশ্চিমী দুনিয়া থেকে নতুন করে আমদানি হয়েছেন। অর্থাৎ, পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করার সুবাদে এদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বৈঠকী আড্ডায় হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়কে (ইসকন) এখন ভারতের পশ্চিমী দুনিয়া বিজয়ের প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়। সত্য সাঁইবাবার 'অলৌকিক' ক্ষমতা নিয়ে ভক্তিভরে চর্চা চলে। এ সবই এমন একটা সমাজে ঘটছে, যা কিনা বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে এগিয়ে চলার কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করছে। ভারতীয় সংবিধান অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘটিয়েছে। কিন্তু গ্রামভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রভাবশালী শ্রেণী 'অস্পৃশ্য'দের এখনও পায়ের তলায় রাখতে বলপ্রয়োগে ইতস্তত করে না। 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে অভিহিত হলেও রাজনীতি ও অপরাধজগতের অশুভ আঁতাতের সুবাদে সমাজে অনেক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সংখ্যার বিচারে এদেশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বিরাট বাহিনী আছে। কিন্তু 'ব্রেন-ড্রেন'-এর দৌলতে এদের এক অংশ নিয়মিত উন্নত দেশে চলে যাচ্ছে। ওই সব দেশের আর্থিক প্রলোভন ও কাজের পরিবেশ, দুটোই আকর্ষণীয়। বাকিরা এদেশেই পড়ে থাকছে এবং উপযুক্ত কাজের পরিবেশ ও সুযোগের অভাবে ক্রমে তারা হতাশক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এদেশের পরিবেশদূষণ প্রক্রিয়ার উপর এখনও পর্যন্ত সরকার তেমন নিয়ন্ত্রণ আনে নি। আগে একটা সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতাদের চটকদার 'জনমুখী' কাজকর্মে সাধারণ মানুষ মোহিত হত, এখন তারাও উদাসীন হয়ে পড়ছে। সংশয়বাদীদের মতে, নেতাদের মিথ্যা আশ্বাসের উপরে এখন নতুন ভারতীয় সমাজের ভিত গাঁথা হচ্ছে।

এই নৈরাশ্যজনক বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেও কিছু আশার আলো অবশ্যই দেখা যায়। যেমন, খাদ্য উৎপাদনে দেশের বিরাট সাফল্য। দেশে এখন নিয়মিত ফসল

উদ্বৃত্ত হচ্ছে। সমস্যা একটাই, গরিবীরেখার নিচের মানুষজনের যথেষ্ট খাদ্যশস্য কেনার ক্ষমতা নেই। ফলে, গরিবদের মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কমই থেকে গিয়েছে। পরিবহন, চিকিৎসা (টিকাদানের ব্যবস্থাসহ), জনশিক্ষা, ক্রেতা-সুরক্ষা প্রভৃতি সামাজিক পরিষেবার সুযোগও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু এই সব পরিষেবার মান এখনও অনেক উন্নত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্ল্যান্ট ব্রিডিং সহ কৃষি গবেষণায়, পারমাণবিক গবেষণা, মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সামরিক বিচারে ভারত এখন একটি বড় আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃত। এমনিতে এধরণের স্বীকৃতির বিশেষ মূল্য নেই ঠিকই, কিন্তু আজকের বিশ্বের জটিল পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি হিসাবে আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে সম্ভবত সবচেয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এদেশের মানুষের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ক্ষেত্রে। যদিও তারা এখনও তেমন সংগঠিত নয়, তবুও মাঝেমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার প্রয়োগের দাবিতে সরব হয় এবং দেশের সরকারকে সাড়া দিতে বাধ্য করে। এসব উপাদানই ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

প্রতিবাদ ও সংস্কার

হিন্দুধর্মকে অনেক সময়ই (অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার) সনাতন ধর্ম বলে অভিহিত করা হয়। হিন্দু দর্শনে শাশ্বত সত্যের অন্বেষণ প্রচেষ্টা রয়েছে, সেই অর্থে হিন্দুধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' অভিধা দেওয়ায় ভুল নেই। কিন্তু হিন্দুধর্ম অবশ্যই পরিবর্তনের স্রোতকে উপেক্ষা করতে পারে নি। নানা অপ্রতুলতা ও ত্রুটির ফলে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্মমতের শাখা বা সম্প্রদায় মাথা তুলেছে। গোড়ায় তারা সমাজে নিন্দিত হলেও পরে স্বীকৃতি আদায় করেছে, এমনকি সামাজিক সম্মানও পেয়েছে। ভারতীয় সমাজে এধরণের নানা প্রতিবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সার্বিক অবদান কতটা, তা পরিমাপ করা সহজ নয়। তবে নিঃসন্দেহে এটুকু বলা যায় যে তাদের অবদানও উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

সন্ত-কবিরা দেশের নানা প্রান্তে সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং ব্যাপক সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই সমাজব্যবস্থায় নিহিত অনৈক্য ও বৈষম্যের কড়া সমালোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই খুবই সাধারণ ঘরে ও নিচুজাতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, হিন্দিভাষী অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সন্ত-কবি কবীর জাতে জোলা ছিলেন। রুইদাস ছিলেন চামার, যারা জাত-পেশায় চর্মকার ও কৃষিশ্রমিক। মহারাষ্ট্রের সন্তকবিদের মধ্যে চোখা মেলাও ছিলেন চামার। গোরা ছিলেন কুমোর, নরহরি স্বর্ণকার, নামদেও

দরজি এবং সাওন্ত মালি। মহারাষ্ট্রের সন্ত-কবিদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুক্তাবাঈ, শাখুবাঈ, জানাবাঈ ও বহিনাবাঈ উল্লেখযোগ্য। অন্য অঞ্চলেও মোটামুটি একই ধারা দেখা যায়।

সমাজে এই সন্ত-কবিদের বাণী বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। যেহেতু নিজেদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করেছিলেন, তাই সহজেই তা বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের হৃদয়ে সন্ত-কবিরা সহজেই জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর ও ভক্তের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যস্থ ব্যক্তিদের ভূমিকা সন্ত-কবিরা নস্যাৎ করে দেন। সেই সঙ্গে পূজা-অর্চনার প্রক্রিয়াও সরল করে তোলেন। সমাজ তাদের যে সম্মান দেয় নি, সমাজের নিচুতলার অবহেলিত গরিব মানুষকে সেই সম্মান দিয়ে সন্ত-কবিরা তাদের মনে নতুন আশার বীজ বপন করেন।

অশিক্ষিত কবীর (1398-1448) বলেছেন:

কাগজ কালি ছুঁই না আমি
না কলম হাতে লই—
চতুর্যুগের গুণের ব্যাখ্যান
মুখের কথায় কই।

তখনকার সমাজের জটিল চেহারা দেখে ক্ষুব্ধ কবীর বলেছেন:

সাধু, জগৎ যেন পাগল দেখি—
খাঁটি কথা বললে ভবে
মারতে আসে সবে।
বললে কথা বানিয়ে মেকী
ভরসা লোকে করে দেখি,
অবাক ব্যাপার একি! (অনুবাদ: শমীক ঘোষ)

একথা বললেও কবীর যা দেখেছেন, সেটাই জোর গলায় বলে গিয়েছেন। সমাজের আচার-কুসংস্কার নিয়ে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের খোঁচা মেরেছেন। ব্রাহ্মণকে বলেছেন, 'পণ্ডিত, সবই ভুল শিখেছ', সাধুকে তিরস্কার করে বলেছেন, "উল্টো পাল্টা ভাবনা ছাড়।" আবার কাজিকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গর্দান নিতে দেখে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন, "তোমাকে ছুরি ধরতে কে বলল?" সাদামাটা ভাষায় ব্যঙ্গ করে কবীর প্রশ্ন তুলেছেন:

পণ্ডিত, মানো তুমি জাতের বিচার
ছুৎ-অছুতের নানান আচার
বল দেখি, কোথায় জন্ম এমন হেন প্রথার!

অথবা,

কাজী, কোন কেতাবের বুলি বল?
সুন্নৎ যদি খোদার কাম্য
তবে কেন তোমার জন্ম
বিনে সুন্নৎ হল? (অনুবাদ : ঐ)

মোটা মোটা পুঁথি পড়লেই পণ্ডিত হওয়া সম্ভব কিনা, এ নিয়েও কবীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, প্রেম ভালবাসার দু-আড়াই অক্ষর শিখতে পারলেই মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

অনেক সন্ত-কবির রচনাতেই সাধারণ মানুষ মুখ্য চরিত্র হয়ে এসেছিল। চোখা মেলা বলেছেন :

বাঁকাচোরা আখ নিশ্চয়
তার রসটা বাঁকা নয়।
যে চেহারা দেখছে চোখে
তবে, তাতে কেন মানুষ ঠকে?
গুণ পরালে ধনুক বাঁকে
তীর কিন্তু সোজাই থাকে।
যে চেহারা দেখছে চোখে
তবে, তাতে কেন মানুষ ঠকে?
নদীর বাঁক তো কতই আছে
বাঁক নেই তো জলের মনে।
যে চেহারা দেখছে চোখে
তবে, তাতে কেন মানুষ ঠকে?
অনেক বটে ভুল ত্রুটি তার
ভক্তি কিন্তু অচল চোখার
যে চেহারা দেখছে চোখে
তবে, তাতে কেন মানুষ ঠকে? (অনুবাদ : ঐ)

অথবা, বাসব কী বলছেন, শোনা যাক:

বৃক্ষ সে তার আহার করে
মুখ রয়েছে তার শিকড়ে
গোড়ায় যখন জল ঢালা, তা'
শাখায় আনে সবুজ পাতা।
নড়ে চড়ে মানুষ ভবে
অন্ন তাদের দিতে হবে
তবেই অন্ন পাবেন প্রভু,
দেখবি নারে অভাব কভু।
মানুষজনেই আছেন প্রভু
এই কথাটি জেনেও তবু
তাদের নিছক মানুষ ভাবিস যদি,
তবে তোর পাতাল গতি। (অনুবাদ: ঐ)

এই সব সন্ত-কবিদের কয়েকজনকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা সম্প্রদায় ও পূজা-অর্চনার রীতির প্রচলন হয়েছিল। উত্তর ভারতে চামারদের জীবন ও মনোজগতে রুইদাসের প্রভাব পড়েছিল। অনেক এলাকাতেই কবীরপন্থী সম্প্রদায় এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী। বাসব ছিলেন বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম স্থপতি, যাঁকে সম্মান জানাতে অনেক সময় বাসবান্না বা বাসবেশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ তাঁকে ভারতের মার্টিন লুথার বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে মনে করেন, সমাজের জাতপাত ও অর্থহীন যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবস্থা নির্মূলের চেষ্টায় গৌতম বুদ্ধের আরব্ধ কাজই বাসব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সন্ত-কবিরা তাঁদের অভীষ্ট সংস্কার প্রচেষ্টায় পুরোপুরি সফল হন নি। তাহলেও অন্যায় সমাজব্যবস্থাকে তাঁরা বড় মাপের ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন, যার ফলে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর মনে আশা জেগেছিল।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন সমাজ-সংস্কারকের অবদানের কথাও উল্লেখ করা যায়। অসমের সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় শ্রীশঙ্করদেবের ভূমিকার কথা আগেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। এখানে আরও তিন সমাজ-সংস্কারকের নাম করা যায়—জ্যোতিবা ফুলে (1827-1870), নারায়ণ গুরু (1856-1928) এবং দয়ানন্দ সরস্বতী (1824-1883)। ফুলে ও তাঁর 'সত্য শোধক সমাজ' মহারাষ্ট্রে প্রবল পরিবর্তনের ঢেউ এনেছিলেন। তাঁরা মানবতাবাদের কথা বলতেন এবং সেই মানবতাবাদ

সাম্য ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া সমাজের অবহেলিত অংশ এবং বিশেষ করে নারীর অধিকার নিয়েও তাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন। নারায়ণ গুরু কেরল সমাজকে প্রভাবিত করেন, যদিও তাঁর সংস্কার আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সুফল শুধু এজাভা সম্প্রদায়ই পেয়েছিল। তাঁর প্রচারিত বাণীর মূল কথা 'এক জাত, এক ধর্ম'। তিনি নানা কুসংস্কার ও পশুবলি প্রথার বিরোধী ছিলেন। সততা ও সত্যনিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা এবং একতার মূল্যবোধকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সমাজে শিক্ষা ও শিল্পপ্রসারে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর অনুগামীদের তিনি সবসময় অন্য ধর্মের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতেন। নারায়ণ গুরুর বক্তব্যের সার্বজনীন আবেদন সহজেই সমাজের বড় অংশকে প্রভাবিত করেছিল। আর্য সমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদী বলে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু তিনিও মানবতাবাদের ভিত্তিতেই সমাজের পুনর্গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের কলুষতা থেকে তিনিও সমাজকে মুক্ত করতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন, সমাজে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ হোক। তাঁর জীবনীকার তারাচাঁদের কথায়, "মানবজীবনকে আরও উন্নত, মহান ও আনন্দময় করে তুলতে হবে—এটাই ছিল দয়ানন্দের বাণী"।

ভারতবর্ষে বহু সাধুসন্ত, স্বামীজি, গুরু এসেছেন, গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে নিতান্তই ভণ্ড, কামিনী কাঞ্চনের প্রলোভনে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে আবার নেহাতই নিরীহ খামখেয়ালী, ছিটগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু শ্রীশঙ্করদেব, জ্যোতিবা ফুলে, নারায়ণ গুরু ও দয়ানন্দের মতো মানুষও সমাজের উদ্ধারকর্তা হয়ে এসেছেন। এঁরা না থাকলে হিন্দু সমাজ অনেক আগেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। সমাজকে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতেও এধরণের মানুষই প্রেরণা জোগান।

ভারতীয় রেনেশাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে সব সমাজ-সংস্কারক পরে এসেছিলেন, তাঁরা ধর্মতত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। তবে সমাজের বড় বড় সমস্যার নিরসনেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। বাল্যবিবাহ, মেয়েদের (বিশেষ করে বিধবাদের) নিপীড়ন, সতীদাহ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মতো অমানবিক আচরণ তাঁদের ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এসব সমস্যা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ ও আর্য সমাজ—সবই প্রচণ্ড আলোড়িত হয়। রক্ষণশীল সমাজ তাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে তীব্র বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তাভাবনা সমাদৃত হলেও হিন্দুধর্ম যে আচার সর্বস্বতায় জড়িয়ে পড়েছিল, তা থেকে সাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসতে পারছিল না।

সমাজের উপরতলায় ওঠার একটি পদ্ধতি 1920 থেকে 1940 সালের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। 'সংস্কৃতায়ণ' নামে পরিচিত এই প্রক্রিয়ায় সমাজের নিচুতলায় অবস্থিত একাধিক জাত-গোষ্ঠী নিজেদের জাত-অবস্থানকে সম্মানজনক জায়গায় তুলে আনার উদ্যোগ নেয়। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা সাধুসন্ত ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের

অনুমোদন আদায়ের চেষ্টা করে। কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এক একটি জাত-গোষ্ঠীকে বড় বড় মুনিঋষির গোত্রভুক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং খুব নিচুজাত না হলে তাদের উপবীত ধারণের অধিকারও দেন। এখন এই 'জাতে-ওঠা'র চেষ্টায় কিছুটা ঢিলে পড়েছে। তা হলেও মাঝে মধ্যেই কোনও না কোনও সম্প্রদায়ের 'জাতে-ওঠা'র অনুষ্ঠানের খবর শোনা যায়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজে এই সব 'জাতে-ওঠা' সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী সত্যিই উপরের তলায় কতটা 'জল-চল' হয়, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আগেকার জাত-পরিচয় মোছার চেষ্টায় 'জাতে-ওঠা' সম্প্রদায়রা অবশ্যই নিজেদের নতুন নামকরণ করে। এ ভাবে কর্মকার হয় বিশ্বকর্মা, নাপিত হয় শ্রীবাস, দরজি হয় নামদেও, জঞ্জাল সাফাইকারী হয় বাল্মীকি। কিন্তু এই নতুন নামকরণ তাদের সামাজিক অবস্থান বদলাতে খুব একটা সাহায্য করে না। সংস্কৃতায়ণের এই প্রক্রিয়ায় অনেক নিচুজাতই উচ্চবর্ণের জাত-আচরণকে অনুকরণের চেষ্টা শুরু করে। সমাজের সংস্কৃতায়ণ মডেলের অর্থ, সমাজের শীর্ষে থাকবে ব্রাহ্মণ। ফলে, ব্রাহ্মণদের আচার-আচরণকে আদর্শ দৃষ্টান্ত ধরে নিলে শুধু ব্রাহ্মণেরই অনুকরণ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে সবসময় তা হয় নি। বরং ব্রাহ্মণসহ একাধিক উচ্চবর্ণের আচার-আচরণকেই নিচুজাতের মানুষ অনুকরণ করে জাতে-ওঠার চেষ্টা চালিয়েছে। এব্যাপারে ক্ষত্রিয়, রেড্ডি, মারাঠা বা নায়ার সমাজের দৃষ্টান্তও তাদের কাছে অনেক সম্মানজনক ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়েছিল। এত সব অনুকরণ সত্ত্বেও তাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন আসে নি। মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ের সতনামী সম্প্রদায়ের কথাই ধরা যাক। এদের বেশিরভাগই ছিল চামার। গুরু খাসিদাসের প্রভাবে এসে 'সতনামী'রা জীবনযাপনের 'শুদ্ধ' আচারবিধি গ্রহণ করে। তারা উপবীত ধারণ করে ও মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। এমনকি মাংসের সঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় তারা বেগুন, টমাটো, গাজরও খাওয়া বন্ধ করে। মদও ছেড়ে দেয়। এত সব করেও সতনামিরা উচ্চবর্ণভুক্ত হতে পারে নি। এখনও তফসিল সম্প্রদায়ভুক্তই রয়ে গিয়েছে। শুধু বৃহত্তর সমাজে অপছন্দ, এমন কিছু কুসংস্কার-কুআচার ছেড়ে দেওয়ার দরুণ সতনামীদের জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এধরণের আরও আন্দোলন হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে পরিবর্তন এনেছে।

রক্ষণশীল সমাজের প্রচলিত অনুশাসন বিধির সঙ্গে মতবিরোধ, কিছুটা প্রতিবাদ ও আংশিকভাবে সংস্কারের চেষ্টাতেই এধরণের আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। সমাজে এসব আন্দোলনের সামগ্রিক প্রভাব কতটা পড়েছিল, তার মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, এই সব আন্দোলনের ফলে সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ কিছু কিছু আলগা হয়েছিল। পরিবর্তনের তাগিদ যে সমাজের ভিতরেই রয়েছে, এ সব আন্দোলন তারই ইঙ্গিতবাহী। খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজেও একই ধরণের আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

অর্থনীতি

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারত প্রধানত চিরাচরিত কৃষি ও কুটির শিল্পের উপরই নির্ভর করত। দীর্ঘ অবহেলায় এই দুই ক্ষেত্রই নির্জীব হয়ে পড়লেও তখন পর্যন্ত আধুনিক কলকারখানা সামান্যই গড়ে উঠেছিল, এবং অর্থনীতিতে তার গুরুত্বও তেমন ছিল না। দেশের কৃষি-অঞ্চলগুলি সেই সব এলাকার প্রধান শস্য দিয়ে চিহ্নিত হত, বেশিরভাগ এলাকাতেই বছরে একটি মাত্র ফসল হত। দু'বার ফসল কম জায়গাতেই হত। অল্পসংখ্যক চাষীই জমির মালিক ছিল, বেশিরভাগই ছিল ভাগচাষী এবং আরও বেশি সংখ্যায় কৃষিশ্রমিক। কৃষিশ্রমিকদের অবস্থা ছিল অনেকটাই ভূমিদাসের মতো। তাদের মাথার উপর সামন্ততন্ত্রের দুই বা তিনস্তর অভিজাত শ্রেণী চেপে বসেছিল। ভাগচাষীদের অবস্থা তুলনায় ভাল হলেও সব সময় তাদের জমি চাষের অধিকার হারানোর ভয় ছিল। কৃষিশ্রমিক ও ভাগচাষী, উভয়কেই গ্রামের বড় ভূস্বামী ও স্থানীয় জমিদারকে বিনামূল্যে নানাধরণের কাজ করে দিতে হত। নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাছাই করা কিছু লোককে গ্রামসমাজ ও সরকারের কাজ করতে হত। গ্রামের জোতদার-ভূস্বামীরা তাদের নিষ্ঠুরতা ও অর্থলোভের জন্য কুখ্যাত ছিল, এবং সরকারি আমলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তারা নানাধরণের অত্যাচার ও কুকীর্তি করেও পার পেয়ে যেত। আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতি আংশিকভাবে যজমানী প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল। 1947 সালের 15 আগস্টের পরে দেশে ভূমিসংস্কার কর্মসূচিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটান হয়, জমির স্বত্বাধিকারের সংস্কার করে ভাগচাষীদের ভূস্বামীতে পরিণত বা জমির মালিকানা দেওয়া হয়। জমির মালিকানার উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এতসব আইন করার পরেও গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাশালী শ্রেণী আইনের নানা ফাঁকফোকর বার করে ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য অনেকটাই বিফল করে দেয়।

গ্রামের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ক্ষমতা ধরে রাখতে স্থানীয়, আঞ্চলিক এমনকি জাতীয়স্তরের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে। কার্যকর জমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন কার্যকর হওয়ার পরেও বাস্তবে খুব সামান্য পরিমাণ জমিই হস্তান্তরিত হয়েছিল। ফলে, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরাও সামনে তেমন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বিনোবা ভাবে-র ভূ-দান ও গ্রাম-দান কর্মসূচির অসারতা প্রমাণিত। ভূমিহীনরা হয় কোনও জমিই পেল না, আর পেলেও বেছে বেছে যে সব অনুর্বর ডাঙ্গা জমি তাদের দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গতির অভাবে তাকে চাষযোগ্য করে তুলতে তারা পারল না। ফলে, আবারও তারা কৃষি শ্রমিক বা ভূমিদাসদের পর্যায়ে নেমে গিয়ে নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করতে লাগল। এমনকি, কৃষিক্ষেত্রে ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিস ও কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের

মতো যে বিরাট বিরাট সরকারি উদ্যোগে বিপুল অর্থ ব্যয় হল, তার সুফল থেকেও তারা বঞ্চিতই থাকল! পরে ঐ ধরণের এক গুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের সুবাদে কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব' হলেও তা গরিব চাষী বা কৃষিশ্রমিকের তুলনায় ধনী চাষীদেরই উপকারে লাগে। গরিব এবং বিশেষ করে তফসিল সম্প্রদায় ও তফসিল জনজাতির মানুষের উপর অত্যাচারের মাত্রা হয়ত দেশে কিছুটা কমেছে। কিন্তু এখনও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের উপর নারকীয় অত্যাচারের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কৃষি ক্ষেত্রে এখনও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের রেশ রয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে সম্ভবত তা থেকেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

কৃষির সহায়ক হিসাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কারিগর শ্রেণী ও কারুশিল্পীদের ভূমিকা রয়েছে। তবে গ্রামের কুটির শিল্পের এটাই একমাত্র ভূমিকা নয়। গ্রামীণ হস্তশিল্প সামগ্রী তার শিল্প-উৎকর্ষের জোরে এখন শহরের ধনী সমাজের আদরের বস্তু। এমনকি বিদেশেও তার সমাদর বাড়ছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রামীণ কারু ও হস্তশিল্প পড়ে গিয়েছিল। এটা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছু কুটিরশিল্প ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছিল। দেশের প্রাচীন তাঁত শিল্প এব্যাপারে জ্বলন্ত উদাহরণ। শিল্পায়ন বেড়ে চলার যুগে এই সব মুমূর্ষু হস্তশিল্প পুনরুজ্জীবনের কাজটা সহজ হয় নি। তবে সরকারের তরফে হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্প বেশ কিছুটা উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জনজাতি-সংস্কৃতি সম্পর্কিত শিল্পকর্মের (ethnic) প্রতি শহুরে মানুষের কৌতূহল বেড়ে চলায় সৌখীন ড্রয়িংরুমেও এখন এসব হস্তশিল্প জায়গা করে নিচ্ছে। আটের দশকে বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে সব ভারতোৎসব হয়, তার দৌলতে সাময়িকভাবে হলেও বিদেশে ভারতীয় হস্তশিল্প ও কারুকলার চাহিদা বেড়েছে। তবে ফ্যাশান মাত্রই স্বল্পস্থায়ী হয়, ফলে এধরণের চাহিদার মেয়াদও অল্পদিন পরেই শেষ হতে পারে। তা হলেও কৃষি ও চিরাচরিত হস্তশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এখনও বজায় রয়েছে। কিছু হস্তশিল্প তার মানের উৎকর্ষের জোরেই টিকে যাবে। যদিও এধরণের কুটির ও হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের পক্ষে এই পেশা থেকে জীবিকা নির্বাহ করা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। এছাড়া পর্যটকদের ফরমায়েশ মাফিক জিনিস বানাতে গিয়ে হস্তশিল্পও তার ঐতিহ্য থেকে সরে আসতে শুরু করেছে।

একটা সময় পর্যন্ত ভারত নিজেকে বিশ্বের নবম বা দশম বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে দাবি করত। সেই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। তবে ভারত যে শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছে তা অনস্বীকার্য। গত কয় দশকেই এই শিল্পায়ন বেশি করে হয়েছে। কিন্তু বড় মাপের শিল্পায়ন সত্ত্বেও এদেশের বিরাট ভৌগোলিক আয়তন ও বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় ওই সাফল্য

যথেষ্ট নয়। দেশের কয়েকটি জায়গায় মধ্যেই বেশির ভাগ কলকারখানা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পপ্রসার ঘটানোর সচেতন প্রচেষ্টার ফলে অনুন্নত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় এখন বেশ কয়েকটি বড় শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এসব হওয়া সত্ত্বেও দেশের শিল্পক্ষেত্রে অসম-বিকাশ অব্যাহত, এবং তার দরুণ গুরুতর আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। বড় বড় শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা ইউনিয়নে জোটবদ্ধ হওয়ার সুবাদে মোটামুটি ভাল বেতন ও কাজের পরিবেশ পাচ্ছে। যদিও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বা কাজের উৎকর্ষ বাড়ানোর প্রশ্নে এখনও গুরুতর সমস্যা থেকেই গিয়েছে শ্রমিকদের অন্যান্য সমস্যাগুলিও রয়ে গিয়েছে যেমন, শ্রমিকবস্তি, ঝুগগি-ঝোপড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মদ্যপানজনিত সমস্যা, নানা রোগ-উপসর্গ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি। শ্রমিক বস্তি এলাকায় মাফিয়া-ডনদের রাজত্ব এবং জোর করে 'তোলা' আদায়ের প্রবণতা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তারা মোটেই বন্ধ করতে পারেনি। সাংবাদিকদের তদন্তমূলক রিপোর্টে বার বার এবিষয়ে আলোকপাত করে বলা হয়েছে, এই সব মাফিয়া চক্র নিজেদের পেশীর জোর ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক মদতে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। একথাও বলা হয় যে, মাফিয়াদের সঙ্গে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের গোপন আঁতাত আছে, এবং গরিবদের উপর অত্যাচার-শোষণ চালাতে তারা একে অপরকে মদত দেয়। বিধানসভা ও লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে রাজনৈতিক দলের টিকিট পেয়ে এই সব অপরাধজগতের লোকজন সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ নিয়ে আলোচনায় 'দারিদ্র্য রেখা'র প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। 'দারিদ্র্য রেখা'র নিচে থাকা মানুষের অবস্থার উন্নতির অনেক চেষ্টা হলেও পরিস্থিতির ইতর বিশেষ হয় নি। এর দুটি কারণ হতে পারে। এক, অর্থনীতি অগ্রগতির চাইতে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুই, বেশির ভাগ উন্নয়ন প্রকল্পই গরিবের অবস্থা ফেরানোর বদলে ধনীর উপকারের দিকে তাকিয়ে তৈরি হয়েছে। 'ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব', বহু ব্যবহারে জীর্ণ হলেও এ কথা এদেশের ক্ষেত্রে সত্য। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। এরফলে সমাজে পরিবর্তনের গতি শ্লথ হতে বাধ্য, যার পরিণতিতে সমাজে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে ভারত অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের কিছু বন্ধুসহ বিদেশের বহু পর্যবেক্ষকই এদেশে গণতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য সম্পর্কে গুরুতর আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই আশঙ্কার পিছনে তাঁদের যুক্তি ছিল, ভারতীয়রা স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের শাসনে অভ্যস্ত। ভারতে

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কোনও অতীত ঐতিহ্য নেই। দেশের নেতাদেরও রাষ্ট্র পরিচালনার জটিল কাজকর্ম সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। অন্যদিকে, জাতপাত ও ধর্মীয় ভেদাভেদের জন্য দেশের জাতীয় সংহতিও খুবই ভঙ্গুর, গণতন্ত্রের ভিত্তি যে ভোটদাতারা তারাও অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছে। এই সব আশঙ্কা সত্ত্বেও ভারতে গণতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা সফল হয়েছে। যদিও তাকে এরমধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, দু ধরণের সঙ্কটই পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

এদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছু প্রাথমিক সমস্যা দেখা দিলেও মোটামুটিভাবে তার ফল সন্তোষজনক, এবং এই ব্যবস্থা তার নিজের মধ্য থেকেই বাঁচার রসদ সংগ্রহ করে নিচ্ছে। এমনকি, মাঝে জরুরী অবস্থা চলাকালীন দেশে যে স্বৈরতন্ত্র মাথা তুলেছিল, গণতন্ত্র তাকেও উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা ঠিক যে স্বাধীনতার পরে দেশের শাসনভার গ্রহণ করার সময় সরকার চালানোর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা নেতাদের ছিল না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নেহরু নিজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরাট দেশনায়ক হিসাবে মাথা তুলতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, সর্দার প্যাটেল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জোরে যাবতীয় দেশীয় রাজার রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অশিক্ষিত ভোটদাতা ও অনভিজ্ঞ নেতাদের ঝুলিতে এরকম আরও বেশ কয়েকটি সাফল্যের খতিয়ান আছে।

স্বাধীনতার আন্দোলন এদেশের মানুষের মনে বেশ কিছুটা জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল, আর স্বাধীনতা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দেয়। এই জাতীয়তাবোধ বা দেশানুরাগ ও নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার পরবর্তী বেশ কিছুদিন দেশের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের লাগাম টেনে রেখেছিল। প্রথম দুটি সাধারণ নির্বাচনে মানুষ মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইতিবাচক ভোট দেয়। কিন্তু এরপর চাপা থাকা অসন্তোষ ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে শুরু করে। দেশবিভাগ হলেও এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় নি। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের জের ধরেই দেশের সামান্য সম্পদের ভাগ পাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতায় তাদের সম্পর্ক আরও বিষিয়ে যেতে লাগল। স্বাধীনতার আন্দোলন চলাকালীন দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পরে কংগ্রেস এনিয়ে গড়িমসি শুরু করায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। এরই মধ্যে তেলেগুভাষীদের জন্য পৃথক রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবিতে অনশন চালিয়ে পট্টি শ্রীরামালুর মৃত্যু আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবি মেনে নেয়। এরপরেই অন্যান্য অঞ্চলের চাপে শেষ পর্যন্ত গোটা দেশে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়। ভাষাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলতেই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছিল। পরে এরই জের ধরে

উপ-আঞ্চলিকতাবাদ মাথা তোলে। অন্ধ্রপ্রদেশে পৃথক তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্রে বিদর্ভ, বিহারে ছোটনাগপুর (ঝাড়খণ্ড) আলাদা রাজ্য গঠনের দাবি তারই উদাহরণ। এই উপ-আঞ্চলিকতাবাদী আকাঙ্ক্ষাকেও আংশিকভাবে মেটানোর উপায় বার করা হয়েছে। যার পরিণতিতে পঞ্জাব তিন তিনবার ভাগ হয়েছে। প্রথমবার অবশ্য দেশভাগের সময়ই পশ্চিম পঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তারপরে পঞ্জাবের একাংশ কেটে নিয়ে হিমাচলপ্রদেশ তৈরি হল। এবং সব শেষে তৈরি হল আলাদা হরিয়ানা রাজ্য। পঞ্জাবী-ভাষী ছোট এলাকা নিয়ে পঞ্জাব রাজ্য থেকে গেল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যার চরিত্র আলাদা। সেখানে উপজাতি গোষ্ঠীগুলি নিজেদের জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পথ ধরেছিল। নাগা ও মিজো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী ও হিংসাত্মক চরিত্র নেয়। দেশের সংহতি অক্ষুণ্ন রাখতে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এধরণের আঘাত সহ্য করার ও প্রয়োজনে এগিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের বেশির ভাগ দাবিই মেনে নেওয়ার মতো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পেরেছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা মোটেই সমস্যামুক্ত নয়, বরং যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও সুরাহা হচ্ছে না। কিছুটা পরিমাণে মৌলবাদের প্রতিক্রিয়াতেই উগ্র হিন্দুত্ব মাথা তুলছে এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছাড়াও কোথাও কোথাও হিন্দু-খ্রীষ্টান, এমন কি হিন্দু জৈন দাঙ্গা হয়েছে। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট তোলপাড় হয়েছে, অনেক রক্তপাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা পার্বত্য এলাকায় (দার্জিলিঙ ও কাছাকাছি এলাকা) এখন শান্তি ফিরে এলেও অসমে আলাদা বোরোল্যাণ্ড গঠনের দাবিতে প্রবল হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীর ফুটন্ত অবস্থায় রয়েছে। পৃথক ঝাড়খণ্ড গঠনের দাবিও নতুন করে মাথা তুলেছে। জাতপাতের সমস্যাকে ঘিরে উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরিতে সংরক্ষণ নীতির পক্ষে বিপক্ষে সমাজের একটা বড় অংশ দু'ভাগ হয়ে গিয়ে এখন সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত। এসবই ভারতীয় রাষ্ট্রের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সংঘর্ষ নিরসনে ও সমস্যা সমাধানে ভারতীয় রাষ্ট্র কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, তারও পরীক্ষা এভাবেই দিতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থাটাও মনে রাখা দরকার। যে সব প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার অধিকাংশই এখন দুর্বল হয়ে পড়ায় বৈধতা হারনোর সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। সরকারে ক্ষমতাশীল নেতাদের দেশশাসনের নৈতিক অধিকারকেই বার বার চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। ভোটের সময় ভয় দেখিয়ে বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষকে ভোট দেওয়া থেকে নিরস্ত করা বা ক্রমাগত বুথদখলের ঘটনা প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। মাঝে মধ্যেই দুর্নীতি ও বড় মাপের কেলেঙ্কারির ঘটনা দেশের সরকারের ভাবমূর্তির উপর কালো ছায়া

ফেলছে। সব মিলিয়ে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই সঙ্গে গত দু'দশকে সমাজবিরোধী, আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের অশুভ আঁতাত যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তাতেও সরকার পরিচালন ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে ভারতীয় সমাজে এধরণের রাজনৈতিক বিকৃতির পরিণতি অবশ্যই গুরুতর হতে বাধ্য, এবং এনিয়ে প্রতিটি দায়িত্ববান নাগারিকেরই গভীর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সংস্কৃতি

ধর্ম, অঞ্চল ও জাতিসত্তার ভিত্তিতেই এদেশে নানা সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে ধর্মের নিরিখটি কিছুটা ভ্রমাত্মক। পূজার্চনা, ধর্মবিশ্বাস ও আচারের ক্ষেত্রে মিলের কথা বাদ দিলে একই ধর্মানুলম্বীদের মধ্যে মিলের ক্ষেত্রটি খুবই সঙ্কীর্ণ। এমনকি পূজার্চনা ও আচার-সংস্কারের দিক থেকেও অঞ্চল ভেদে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সংস্কৃতির মাপকাঠিতে সব হিন্দুর অভিন্ন পরিচয় নেই, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাশ্মীর ও তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্য অনেক। একই ভাবে উত্তরপ্রদেশ ও কেরলের মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ফারাক অনেকখানি। তুলনায় আঞ্চলিক পরিচয় অনেক বাস্তবসম্মত। একই অঞ্চলের ভিন্ন ধর্মের মানুষরা সবাই একই ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা, এমনকি একই ধরণের মূল্যবোধের অংশীদার। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিজেদের বাঙালি পরিচয়ে গর্ব বোধ করে। একইভাবে, অন্যান্য এলাকাতেও একই অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইসব আঞ্চলিক সংস্কৃতির তারতম্য হিন্দু ও মুসলমান মৌলবাদ সহজে মুছে ফেলতে পারবে না। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড় যথেষ্ট মজবুত। যেমন, নাগাল্যাণ্ডের মতো ছোট্ট রাজ্যে অন্তত এক ডজন নাগা জাতিগোষ্ঠী আছে, এবং তাদের মধ্যে বেশভূষা, ভাষা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ফারাক রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী প্রধান জেলা বস্তারে ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের উৎস হিসাবে যে জাতির নাম করা হয়, তা থেকে বিভ্রান্তি হতেই পারে। যেমন, বস্তারের অবুঝমারিয়া, ছত্তিশগড়ের আমাত ও ধুর-গোঁড়, এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কোয়া ও রাজ-গোঁড়, এরা সবাই নিজেদের কইতুর জাতির শাখা-প্রশাখা হিসাবে দাবি করে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক। তাই, ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বর্ণনা করার চেষ্টা প্রায় দুঃসাধ্য।

দেশের এই সাংস্কৃতিক চালচিত্রের মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতিগুলিই বেশি করে নজরে পড়ে। কিন্তু এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যেও প্রাচীন সনাতনী ঐতিহ্যকে

টেনে আমার নিরলস প্রচেষ্টা চলে। হিন্দুরা তাদের বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ, মুসলমান তার কোরান ও হাদিশ, খ্রীষ্টানরা ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেন্টের মধ্যে দিকনির্দেশ খোঁজে। সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এই মডেল সমাজই তৈরি করে নেয়। এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেই সমাজজীবনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যাও বদলে যায়। মাঝে মধ্যে এধরণের ধর্মীয় পরিচিতি থেকে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা আসে। তবে আদিবাসীদের মতোই কিছু কিছু গোষ্ঠীর অবশ্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কাছে ফিরে যাওয়ার ঐতিহ্য নেই।

আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপর আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এসেছে। এক, পশ্চিমী দুনিয়ার প্রভাব, দুই, জাতীয় সংস্কৃতির হালফিলের স্টাইল এবং তিন, জনপ্রিয় সংস্কৃতি বা পপুলার কালচার। স্বাধীনতার আগে এদেশের অভিজাত সম্প্রদায় ও সিভিল সার্ভিসের দেশীয় আমলারা বিলিতি আদবকায়দা রপ্ত করেছিলেন। বিলিতিয়ানার ঢেউ এখন উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজকে গ্রাস করে গ্রামাঞ্চলেও একটু একটু করে পৌঁছচ্ছে। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় দেশে নতুন নতুন স্টাইল তৈরি হয়েছিল। তার কিছু রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে। গান্ধীটুপি ও খাদিবস্ত্র এখন নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকি ব্যবহারে সীমিত হয়ে পড়লেও যে সময় এসবের প্রচলন হয়েছিল তখন তা দেশকে এর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল এবং দেশজুড়ে কিছুটা মাত্রায় অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। প্রধানত গণমাধ্যমের সূত্রেই দেশে এখন যে পপুলার কালচার গড়ে উঠেছে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে তার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে চলচ্চিত্রের প্রভাব বিরাট। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে নির্দিষ্ট আকার দিতে রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকাও কম না। নান্দনিক মান নিচু হলেও সাধারণ মানুষের উপর তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। আধুনিক গণমাধ্যম একই সঙ্গে ঐতিহ্য ও জনস্বার্থকেন্দ্রিক বিষয়কে তুলে ধরছে। গণমাধ্যমে প্রচারিত অনেক কিছুই এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী একযোগে অনুকরণ করতে শুরু করেছে।

ভারত সংস্কৃতি-সচেতন দেশ। স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। দেশের জাতীয় ও রাজ্যস্তরের মিউজিয়ামে বহু মূল্যবান সংগ্রহ রাখা আছে। ব্রিটিশদের তৈরি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া শুধু এদেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থাই করেনি, সেই সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহু অজানা বিষয়ে আলোকপাত করেছে। ব্রিটিশদের উদ্যোগেই তৈরি অ্যানথ্রপলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া নৃতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জাতি-জনজাতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জুগিয়েছে। বিভিন্ন ঘরানার চিত্রকলা ও সঙ্গীতচর্চা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার সঙ্গেই তাকে আরও সমৃদ্ধ করে চলেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংস্কৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। জাতীয় স্তরে

তিনটি আকাদেমি গঠন করে সাহিত্যচর্চা, গ্রাফিক ও অন্যান্য চিত্রকলা, সঙ্গীত-নাটক প্রভৃতির চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃতির এই সব ক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিতে বেশ কয়েকটি জাতীয় সম্মান ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থ প্রকাশ, চিত্র-প্রদর্শনী, সঙ্গীত, নৃত্যানুষ্ঠান ও নাটকাভিনয়ের আয়োজন, আলোচনাসভা প্রভৃতির মাধ্যমে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যস্তরেও একই ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। সাতের দশকের মাঝামাঝি শুরু করে আটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত নানা সাংস্কৃতিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। ওই সময় ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান প্রভৃতি বহু দেশে ভারতোৎসবের আয়োজন করা হয়। ওই সব উৎসবে ভারত তার নিজের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিদেশী মানুষের সামনে তুলে ধরে। বিনিময়ে কয়েকটি দেশ ভারতের মাটিতে তাদের দেশের উৎসবের আয়োজন করেছিল। ওই সব উৎসবের উল্লেখযোগ্য একটি দিক হল, সেখানে ধ্রুপদী সংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি এবং পপুলার কালচার-এর নমুনা সবই প্রদর্শিত হয়েছিল। ওই ধারারই অনুষঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'অপনা উৎসব' করা হয় এবং বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়া হয়। লোকশিল্পী ও কারুশিল্পীদের জীবনে দীর্ঘদিন এরকম ভালসময় আসে নি। সমাজের কাছে তারা এখন নতুন করে সম্মান পেতে শুরু করল।

এই সব সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রকৃত মূল্যায়নের সময় এখনও হয়নি। তবে এধরণের উৎসব সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও সংস্কৃতি-চেতনা বাড়িয়েছে, লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের তাগিদ বাড়িয়েছে, সেই সঙ্গে গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বদ্ধ জায়গা থেকে মুক্ত করে এনে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে হাজির করেছে। সমাজে এর প্রভাব আরও দু-তিন দশক পরে বোঝা যাবে।

লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকও এখন জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে সত্যিকারের জাতীয় সংহতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অনেক ক্ষেত্রেই বিমিশ্র ভারতীয় চরিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যেমন, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কখনই ধর্মীয় ভেদাভেদ মানে নি। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিকাশে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান অবদান। নামীদামী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অনেক মুসলমান, খ্রীষ্টান ও শিখ আছেন। চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কেও একই কথা খাটে। শিল্পকলার রসাস্বাদনের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বেড়া কোনও প্রতিবন্ধক হয় না। উত্তর ভারতের কত্থক, দাক্ষিণাত্যের ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি ও কথাকলি, পূর্বভারতের ওড়িশি ও ছৌ (ওড়িশা) এবং মনিপুরী (মনিপুর) নৃত্য সারা দেশেই দর্শক সমাদর পেয়ে থাকে।

সমাজ : ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন

ভারতের অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এই প্রেক্ষাপটে দেশের সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান ধারাগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিন্দু সমাজের সাতটি মূল বৈশিষ্ট্যের তালিকা দেওয়া হয়েছিল—জন্মসূত্রে জাতের যাবতীয় গুণের উত্তরাধিকার, সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, শুদ্ধাচার বা ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার, পুরুষার্থ, আশ্রম, ঋণদায় ও কর্ম। এরমধ্যে প্রথম তিনটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। জন্মসূত্রে কে কোন জাত, তাই দিয়েই সমাজে তার মর্যাদার অবস্থান পূর্বনির্ধারিত। এই নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদার অবস্থান ধরে রাখতে তাকে তার জাত-ধর্ম, জাতের আচারবিচার মেনে চলতে হয়। শুদ্ধাচার ও ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলার জটিল সব নিয়ম পালন করতে হয়। পুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেই এই চার অভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করতে হয়। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, জীবনের চার পর্যায়ে এই চার আশ্রম দ্বিজবর্ণের সবার ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়। আশ্রম ও ধর্মের সম্পর্ক নিবিড়। ভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তি ও জাতের কর্তব্য—এসবই ধর্মাচরণের অঙ্গ, যা পুরুষার্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রতিটি আশ্রমপর্বে নির্দিষ্ট ধর্মাচরণের কথাও বলা আছে। হিন্দুশাস্ত্রে কর্মের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হল মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। অবশ্য কর্মের সাহায্যেই অতীতের ভুল সংশোধন ও ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করার নিদানও শাস্ত্রেই দেওয়া আছে। হিন্দুধর্মের এরকম বেশ কিছু তত্ত্ব খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মতত্ত্বে গ্রাহ্য হয় না। তবে ভারতীয় খ্রীষ্টান ও মুসলমান, বিশেষ করে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের চিন্তায় ও বিশ্বাসের গভীরে হিন্দুধর্মের এসব তত্ত্ব এখনও শিকড় গেড়ে রয়েছে। বাস্তবিক, কয়েকটি বিশ্বাস ও সংস্কার এমনই জোরালো যে বাইরে থেকে যারা এদেশে ভিন্ন ধর্ম প্রচার করতে এসেছে, তারাও তাতে প্রভাবিত না হয়ে পারেনি।

দীর্ঘদিনের এই ধর্মবিশ্বাস কী পরিবর্তনের হাওয়ার মুখে নিজেকে একই জায়গায় ধরে রাখতে পেরেছে? পশ্চিমী দুনিয়ার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব এই হিন্দুধর্মের উপর কতটা পড়েছে? দেশ স্বাধীন হওয়ায় কী সমাজ পরিবর্তনের ধারায় গতি এসেছে?

বর্ণব্যবস্থা, জাতপাত, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ও ছোঁওয়াছুঁয়ি, হিন্দুসমাজের এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর বার বার আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছে। গোড়ায় এই আঘাত এসেছিল প্রতিবাদী চিন্তার অনুসারীদের কাছ থেকে, পরে সন্ত-কবিদের কাছ থেকে। আরও পরে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নতুন করে আঘাত এসেছিল নবলব্ধ জ্ঞান ও দর্শনের কাছ থেকে। বিদেশিরাও হিন্দুদের এই সব বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে

কটাক্ষ ও পরিহাস করতে ছাড়েনি। বিদেশিদের চোখে হিন্দুদের এসবই ঘৃণার ব্যাপার মনে হত। কিন্তু এতসব আক্রমণের মুখেও হিন্দুধর্ম টিঁকে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছে। আক্রমণের মুখে সাময়িকভাবে পিছু হটলেও পরে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ প্রায় আগের অবস্থানেই ফিরে গিয়েছে। আধুনিক বিশ্বে সাম্যবাদী চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার যুগেও হিন্দুসমাজে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ও ছোঁওয়াছুঁয়ির বিচার কিছুটা হলেও এখনও টিঁকে রয়েছে। প্রকাশ্যে এসব নিয়ে সমালোচনা হলেও আড়ালে অনেকেই এসব মেনে চলে। আগেই বলা হয়েছে, অন্য ধর্মগুলিতেও এসব বিশ্বাস ও আচারবিচারের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছিল। হিন্দুদের এই জটিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত অস্পৃশ্যতা ও মেয়েদের প্রতি নানা বৈষম্যমূলক আচরণকে সমাজ-সংস্কারকরা মেনে নিতে পারেন নি। মহাত্মা গান্ধী এসবের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে আইন করে অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং সমাজে মেয়েদের অবস্থান উন্নীত করার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে 'অচ্ছুৎ' এবং মেয়েরা এখনও পুরোপুরি মুক্তি পায় নি।

হিন্দুশাস্ত্র নির্দিষ্ট পুরুষার্থ, আশ্রম, ঋণদায় ইত্যাদি কর্তব্যকর্ম এখনকার হিন্দু সমাজ কতটা পালন করে তা জানার সেরকম কোনও মাপকাঠি নেই। এমনিতে অবশ্য এসবে অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য, জীবনের চার পর্ব, ব্যক্তির সামাজিক ও ঔপচারিক কর্তব্য বলে শাস্ত্রকাররা যা বিধিবদ্ধ করে ছিলেন, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কারণ এসবই এক শ্রেয় জীবনের কথা বলছে। কিন্তু বাস্তবে তা পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য এখনকার সমাজের হাতে কোনও ব্যবস্থা নেই। এরমধ্যে যেটা লক্ষণীয়, তা হল কর্মফল-সহ এসব যাবতীয় বিশ্বাস, আচার-বিচার এখনও হিন্দুসমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এবং তা এতটাই গভীরে ঢুকে রয়েছে যে পাল্টানোর চেষ্টা করাও অর্থহীন। তা ছাড়া এ সবের কিছু কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে।

সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ঘটানোই বর্ণের অন্যতম ভূমিকা। আগেই দেখেছি, প্রতিটি বর্ণের ছাতার তলায় একগুচ্ছ জাত রয়েছে। সামাজিক আচার-সংস্কারের দিক থেকে তাদের মর্যাদা মোটামুটি কাছাকাছি পর্যায়ের। এখন নতুন একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে। প্রতিটি দ্বিজবর্ণ নিজেদের জন্য আলাদা করে সামাজিক-রাজনৈতিক মঞ্চ বা সংগঠন গড়ার চেষ্টা করছে। এভাবেই সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ মহাসভা, সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় মহাসভা ও সর্বভারতীয় বৈশ্য মহাসভা গড়ে উঠেছে। এরকম প্রতিটি স্তরেই সমান্তরাল ধাঁচের বহু সংগঠন রয়েছে। এই সব সংগঠনের সদস্যরা মাঝে মধ্যেই নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়, তাদের নেতারা সেখানে ভাষণ দেয়, বিভিন্ন বিষয়ে তারা প্রস্তাবও পাস করে। নিজেদের সমাজে সংস্কারের প্রয়োজন বা রাজনৈতিক দিক থেকে নিজেদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তারা আলোচনা করে। মোটামুটিভাবে একটা বিষয় তারা মেনে নিয়েছে যে এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

একাই সবর্ণের বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। নির্বাচনে রাজনৈতিক সমর্থন জোগাড় করতেও বর্ণ আনুগত্যের প্রশ্নটি খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলেও আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় স্তরে এধরণের বর্ণভিত্তিক সংগঠন গড়ার রেওয়াজ ছিল। জাতপ্রথা মানা হচ্ছে কি না, সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি না, সে সব নিয়েই ওই বর্ণ সংঠনগুলি মাথা ঘামাত। তারা ওই সময় বাল্যবিবাহ রদ, আচার-সংস্কারের নিয়মবিধি সরলীকরণ, সামাজিক অনুষ্ঠানে অহেতুক ব্যয় কমানোর জন্য প্রস্তাব নিয়েছিল। সামাজিক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা এই সব সংগঠনের কাজকর্ম সেভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নি। তাই এধরণের সংগঠন এবং তাদের নেওয়া প্রস্তাবগুলি তাদের নিজের নিজের জাতসমাজে কতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিল, তা বোঝা সুকঠিন। এটুকু বলা যায় যে, এই সব বর্ণসংগঠনগুলির ঘোষিত সদিচ্ছা সত্ত্বেও পণপ্রথা এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে। স্বাধীনতার পরে জাতপাতের রাজনীতি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়েছে এবং নির্বাচনে ক্রমশই এর গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জাতীয়তাবাদী দল থেকে শুরু করে বামপন্থীরা পর্যন্ত, সবাই জাতপাতকে কাজে লাগাচ্ছে। রাজনীতির কঠোর বাস্তবতা নেতাদের বাধ্য করেছে জাতপাতকে মেনে চলতে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তারা অনেক সময় দু'ধরণের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল এক কেন্দ্রে একই জাত থেকে প্রার্থী দেয়। অথবা, জাত-ভোট ভাগাভাগি করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে একই জাতের নির্দল প্রার্থীদের গোপনে মদত দেয়। রাজনীতির এই প্রবণতা জাতগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে এবং উত্তেজনা ও সংঘর্ষ বাড়িয়ে চলেছে। কোনও কোনও এলাকায় সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে পদানত করে রাখার জন্য একাধিক উঁচু জাত নিজেদের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলেছে।

যাই হোক, অন্তত স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি প্রভৃতি জায়গায় এবং জনপরিবহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার অনেক কমে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে যজমানী সম্পর্ক এখন অনেক দুর্বল, শহরে তা নেই বললেই চলে। নানান ধরণের চাকুরির সুযোগ বাড়ায় পরিবারের একটা বড় অংশের মধ্যে জাত-পেশা ছেড়ে চাকুরি নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। জাত-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে এসেছে। আদালত ও গ্রামপঞ্চায়েত তাদের কিছু কিছু ভূমিকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজকাঠামোয় জাতপাত এখনও একটি সক্রিয় উপাদান হিসাবে রয়ে গিয়েছে।

পরিবারের অস্তিত্বও এখন চাপের মুখে, আত্মীয়তার বন্ধনও আগের মতো মজবুত নেই। যাই হোক, যৌথ পরিবারের যে ধারণাটি বহুল প্রচলিত, তা ভারতীয় সমাজে কখনই সেভাবে ছিল না। গ্রাম ও ছোট শহরে কয়েকটি জাতের মধ্যেই যৌথ পরিবার চালু ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও দুই থেকে তিন পুরুষ একসঙ্গে বাস করার ঘটনা বিরল। আধুনিক শিক্ষা, নতুন নতুন জীবিকা, স্থানান্তরে বাস,

গণমাধ্যমের প্রভাব, এরকম অনেক কারণেই পরিবার ও আত্মীয় সম্পর্কের ভিত আলগা হয়ে এসেছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন এখনও একত্র হয়। আধুনিক পেশায় যুক্ত শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে বাড়িতে বয়স্কা আত্মীয়কে রাখার একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে। গৃহস্থালীর কাজ করার সঙ্গেই বাড়ির বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব ওই আত্মীয়ার উপর ন্যস্ত হয়। ব্যবসাবাণিজ্য করতে গিয়ে পুঁজির প্রয়োজনে এখনও পরিবারের নিকটাত্মীয়দের সাহায্য নেওয়ার চল হারিয়ে যায় নি।

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গেই যে সব নতুন মূল্যবোধ দেখা যাচ্ছে, তা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম কেন প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে? মেয়েদের সমানাধিকারের ক্রমবর্ধমান দাবি পরিবারের বর্তমান কাঠামোর উপর কতটা প্রভাব ফেলবে? সমাজ কাঠামোর উপরেই বা তার কী প্রভাব পড়বে? নিচুতলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টার দরুণ সমাজ কী ভারসাম্য হারাতে চলেছে? চারিদিকে জাতিসত্ত্বার আন্দোলন ও ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দেওয়ারই বা কী ব্যাখ্যা হতে পারে? সমস্যাগুলি বেশ অস্বস্তিকর, তবে নতুন নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে এধরণের প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সমাজ এসবের উত্তর খোঁজারও চেষ্টা করেছে। এখনকার দিনে সমাজ-পরিবর্তনের বহরটা বিশাল হয়ে পড়ায় তা সামলানোর কাজটাও জটিল ও কঠিন হয়ে পড়েছে। সাময়িক রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে গিয়ে বর্তমান সমাজ অনেক সময়েই সমস্যা সমাধানের বদলে তাকে বাড়িয়ে তুলছে। অতীতের কিছু অধ্যায় ভুলে যাওয়ার বদলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর তিক্ত অতীত ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে, পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

যে কোনও প্রাচীন সমাজই বিরাট আকারের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বাধাবিপত্তির সামনে পড়তে বাধ্য। এখন ভারত যে নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। দেশের মানুষ পরিবর্তনে আগ্রহী, এবং সমাজ কোন দিকে এগোবে সেটাও মানুষ স্থির করে দিতে চেষ্টা করছে। খাদ্য উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এবং শিল্পায়নে দেশের সাফল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সমস্যা, অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ে এখন দেশে যে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে, তা আগে দেখা যায় নি। এর থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় সমাজ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। সবচেয়ে আশাপ্রদ ঘটনা হল, সাধারণ নাগরিক এখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। সব মিলিয়ে ভারতীয় সমাজ বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে ভারতীয় সমাজ নানা আঘাতের মুখে সাময়িকভাবে কিছুটা সংশয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে। এই সব আঘাত অবশ্যই সমাজ দেহকে কিছুটা

আহত করছে, কিন্তু তা এড়ান অসম্ভব। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সমস্যাকেই সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা দরকার ও সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা উচিত। আর্থিক বৈষম্য ও অবিচারের সমাধানও বার করতে হবে। জনচেতনার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিতে হবে। ইতিহাসের নামে কল্পকাহিনী ও কিংবদন্তীর দাসত্ব থেকে সমাজকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস চেতনা বাড়িয়ে তুলতে হবে। অতীতের কিছু ভাল ঐতিহ্য তাদের উপযোগিতার জোরেই টিঁকে থাকবে, কিন্তু কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে দূর করতে হবে। শোষণ ও অত্যাচারের ব্যবস্থাকেও নির্মূল করা দরকার। সামনের পথ সুদীর্ঘ, যাত্রাও পীড়াদায়ক হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতিটি নাগরিকই দায়বদ্ধ।

আরও জানতে হলে

একথা বলা বাহুল্য যে এত বড় দেশের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও সামাজিক সংগঠনগুলির সব দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে করা অসম্ভব। আগ্রহী পাঠকমাত্রই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমাজ-কাঠামো সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে চাইবেন। তাঁদের কৌতূহল মেটাতে প্রয়োজনীয় বইয়ের একটি ছোট্ট তালিকা দেওয়া হল। এর কোনওটিই খুব গুরুগম্ভীর বই নয়, বরং সাধারণ পাঠকের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সে ভাবেই লেখা।

রোমিলা থাপার-এর History of India (Vol.I) বইটি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে চমৎকার ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। পেঙ্গুইন থেকে 1966 সালে প্রথম প্রকাশের পর 1982 সালের মধ্যেই বইটির দশটি পুনর্মুদ্রণ হয়ে গিয়েছে। পেপারব্যাক সংস্করণে পাওয়া যায় এবং দামও খুব একটা বেশি নয়। রোমিলা থাপার-এর আর একটি বই The Past and Prejudice (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ 1990)। অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অনেক বদ্ধমূল সংস্কার দূর করতে ও অন্ধআবেগতাড়িত দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ করতে বইটি সাহায্য করতে পারে। আগের বইটির মতোই এটিও সুলভ ও সহজপাঠ্য। পার্সিভাল স্পিয়ারের A History of India (Vol.2) বইটিতে মোগলযুগ থেকে স্বাধীন ভারতের সূচনাপর্ব পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস ধরা রয়েছে। এটিও পেঙ্গুইন পেপারব্যাকে পাওয়া যায়। তুলনায় আকারে একটু বড় হলেও এ.এল.বাসমের The Wonder that was India (London, 1954; পরে ভারতে পুনর্মুদ্রিত) এবং ডি.ডি.কোসাম্বির The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline (London, 1965; ভারতীয় সংস্করণও আছে)—দুটিই সুখপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় বই। আধুনিক ভারত সম্পর্কে ভাল করে জানতে হলে সুমিত সরকারের Modern India (1885-1947) অবশ্যই পড়া উচিত। কিছুটা পুরনো হলেও কে.এম.পানিক্করের A Survey of Indian History (বোম্বাই, 1947 ; এবং পরে একাধিক পুনর্মুদ্রণ) এখনও পড়তে খারাপ লাগার কথা নয়।

ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী একাধিক বই লেখা হলেও ভারতীয় সমাজ বিষয়ে তেমন সহজবোধ্য ও নির্ভরযোগ্য বই খুব একটা নেই। বিভিন্ন আদিবাসী ও জনজাতি সম্পর্কে অবশ্যই বহু ভাল ভাল তথ্যপূর্ণ গবেষণাপত্র আছে। এক একটা গ্রাম ধরে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা ও নিবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এসবই বিশেষজ্ঞদের জন্য, সাধারণ পাঠকের মনের খোরাক এ থেকে মেটা অসম্ভব। The Gazetteer of India: Indian Union (Vol.I)-এর "Country and People" (Delhi, 1965) বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার অল্প দামে পাঁচটি ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। প্রাকৃতিক ভারতের ভৌগোলিক পরিচয়, জনসাধারণ, ধর্ম, ভাষা ও সামাজিক কাঠামো—এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে পুস্তিকাগুলি

লেখা। কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিকেশন ডিভিশন 1969-70 নাগাদ তা প্রকাশ করে। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পেতে হলে এই পাঁচটি বইই পড়ে ফেলা ভাল। বিশেষ করে সামাজিক কাঠামো নিয়ে লেখা পুস্তিকাটি আগ্রহী পাঠককে সাহায্য করবে। গ্রামীণ ভারতের জীবন সম্পর্কে জানতে হলে এস.সি. দুবের Indian Village (London and Ithaca, 1955; এবং একাধিক ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ ও ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ পাওয়া যায়) পড়া যেতে পারে। এম. এন. শ্রীনিবাসের Social Change in Modern India (Berkeley and Los Angeles. 1966; ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ ও পেপারব্যাক সংস্করণসহ) বইটিতে একই বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। আরও গভীরে যেতে ইচ্ছুক পাঠকের জন্য ডিভিড ম্যানডেলবম-এর Society in India (Berkeley and Los Angeles, 1970) বইটি সুপারিশ করব। বইটিতে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের ধারাগুলির অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বইটি পরে ভারতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এবং পেপারব্যাক সংস্করণও পাওয়া যায়।

□□

Lasertypeset at Meghna Computer Service, Calcutta-700006 and printed at Tarang Printers, Delhi-110092